

অগ্রন্থ্য, - ২, ৪

Cuk-H05227-43-11 ৪৭৭৪

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

43

(ত্রৈমাসিক)

ত্রিচত্বারিংশ ভাগ

—•—

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

—•—

কলিকাতা

২৪৩/১ অপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দির
হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত

১৩৪৩

ত্রিচত্বারিংশ ভাগের

সূচীপত্র

প্রবন্ধ	লেখক	পৃষ্ঠা
১। উড়িষ্যার বৈষ্ণব-সাহিত্যে চৈতন্য- দেবের কথা—	শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায় এম এ,	৭৬
২। কবি শেখ চান্দ—	ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, এম এ, পি এচডি	৯৬
৩। কয়েকটি জাগগান—	মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন এম এ	৮২
৪। দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস—	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬০
৫। দ্বিজ রামকুমারের ভাগবত—	শ্রীস্বধীরকুমার মুখোপাধ্যায়	১২০
৬। দ্বিজ রামচন্দ্র বা কবিকেশরী রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার—	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৭১
৭। পবনদূত-বর্ণিত বাঙ্গালা দেশ—	শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ	৪২
৮। বড়ু চণ্ডীদাসের পদ—	ডক্টর মুহম্মদ শহীজুল্লাহ, এম এ, বি এল, ডি লিট	২৫
৯। ঐ সম্পর্কে বক্তব্য—	শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন ও ডক্টর শ্রীস্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট	৩
১০। বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাংলা অভিধান—	শ্রীমজনীকান্ত দাস	১৬
১১। বঙ্গভাষায় রচিত প্রথম ইংরাজী ব্যাকরণ (আলোচনা)—	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮
১২। বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস—	ঐ ঐ	২
১৩। ঐ (বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা)—	ঐ ঐ	১২
১৪। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল—	ডক্টর শ্রীস্বকুমার সেন, এম এ, পি এচডি	৬
১৫। মহাভারতে স্থানীয়মানতক—	ডক্টর শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত ডি এসসি,	১৬
১৬। মারঠা জাতির অভ্যুদয়—	শ্রর যদুনাথ সরকার এম-এ, ডি-লিট	
১৭। শাহ মোহাম্মদ সগীর—	ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক এম এ, পি এচডি	১৪
১৮। শিবাজী	শ্রর যদুনাথ সরকার এম-এ, ডি-লিট	
১৯। শিবাজীর পর মারঠা ইতিহাসের ধারা—	ঐ ঐ	১
২০। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনাকাল—	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ	১৭
২১। সাহিত্য-বার্তা—	পত্রিকাধ্যক্ষ	৪৫, ৮৭, ১৩৫, ১৮
২২। স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যা- লিখনের প্রচলিত সঙ্কেতটির উদ্ভাবনকাল	রায় সারদাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় বাহাদুর এম এ	১১

২৪ অধ্যায়

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

[ত্রিচত্বারিংশ ভাগ]

মারাঠা জাতির অভ্যুদয় *

আমাদের এই বাঙ্গালার সঙ্গে মহারাষ্ট্রের সম্বন্ধ একটি আশ্চর্য জিনিষ। দেশ দুটি রতের বিপরীত দিকে স্থিত। ভাষা ও সাহিত্যে তাহাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল ভেদ। বাঙ্গালীরা মাছ, মাংস খায়, শাক্ত ব্রাহ্মণ পর্যন্ত; কিন্তু মহারাষ্ট্র দেশে মাংস ত খাবুক, মাছ পর্যন্ত খাইলে সে বাড়ীতে জলাচরণীয় চাকর থাকিবে না। একমাত্র মারাঠা কৃষি বা অসিজীবী জাতের হিন্দুদের মধ্যে পাঠার মাংস এমন কি মনু-নিষিদ্ধ পক্ষীর পর্যন্ত খাইবার প্রথা আছে, কিন্তু ভদ্রভোজ ও সার্বজনীন নিমন্ত্রণে নিরামিষ খাওয়া চলে না।

অথচ বাঙ্গালা ও মহারাষ্ট্রের মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে যেমন প্রাণের সম্বন্ধ স্থাপিত আছে তেমন অন্য কোন দুই প্রদেশের মধ্যে হয় নাই। নবাবী আমলে বর্গীর হাঙ্গামা র মত বাঙ্গালার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল ও চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে মতিলাল ঘোষ ও তিলকের অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব, বা বঙ্গীয় শিক্ষিত জনমতের উপর মেলের রাজত্ব না ধরিয়া, এখানে সাহিত্য-ক্ষেত্রে এই দুই জাতির সমন্বয় একটু ভাবিয়া লওয়া উচিত। রাজপুতানার পরই মহারাষ্ট্র-ইতিহাস বাঙ্গালা-সাহিত্যকে সবচেয়ে বেশী অনুপ্রাণিত করেছে। রমেশ দত্ত রাজপুত-জীবনসন্ধ্যার পরই মারাঠা-জীবনপ্রভাতের কিরণ দেখিয়া মুগ্ধ হন। বঙ্গীয় কবি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—

মহারাষ্ট্র জাতি—শয়নে ও যার

শিয়রে, তুরঙ্গ, কটবন্ধে অসি,

যুবরাজ, আজি সে জাতি কোথায় ?

জননাথ ঠাকুরের প্রথম বৃহৎ সাহিত্য-প্রচেষ্টা মহারাষ্ট্র দেশে। রবীন্দ্রনাথ মহারাষ্ট্রের প্রাপ্তে কার্ণাটের বন্দরে সেই “তোমায় চিনি ওগো বিদেশিনী”-কে দেখিয়াছিলেন, ততর আহমদাবাদের শাহীবাগের পুরাতন প্রাসাদে ক্ষুধিত পাষাণের মধ্যে অতীতের চলচ্চিত্র দেখিয়া “সব বুঠা ছায়” এই সত্য বুঝিয়াছিলেন। রমেশচন্দ্রের কর্মজীবন মারাঠা রাজ্যেই অবশেষ হয়। আর বঙ্কিমের অনুবাদক ও অনুকারিগণ মারাঠা

সাহিত্যে এক যুগান্তর আনিয়া দিয়াছে। অল্পদিন আগে পর্যন্ত মহারাষ্ট্রে বাঙ্গালীরা আদর ছিল, যেমন ৩০ বৎসর পূর্বে পঞ্জাবে ছিল।

ভারত ইতিহাসের মধ্যযুগের শেষে মারাঠা জাতির রাজনৈতিক আবির্ভাব শক্তিবিস্তার একটি অতুলনীয় ঘটনা। আমরা সাধারণতঃ শিখ স্বাধীনতা ও মারাঠা শক্তি উদয়কে এক রকম ঘটনা বলিয়া মনে করি, কিন্তু দুটির মধ্যে পার্থক্য বড় বেশী। শিখে একটি মাত্র প্রদেশে আবদ্ধ ছিল, তাহাদের সংগ্রাম মুঘল রাজশক্তির সঙ্গে হয় নাই, আফগান দুর্বরাণী রাজের সঙ্গে হয়; এবং শিখ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং স্বাধীনতা অর্ধ শতাব্দীরও কম সময় স্থায়ী ছিল। অপর পক্ষে, মারাঠা শক্তি দিল্লীশরের সঙ্গে দীর্ঘকাল যুঝিয়া অবশেষে দিল্লীতে রাজার উপর রাজা হইয়া বসে; এই শক্তির প্রভাব সমস্ত ভারতকে আচ্ছন্ন করে আর মারাঠা স্বাধীন রাজত্ব ১৬৬৭ হইতে ১৮১৭ পর্যন্ত ১৫০ বৎসর ব্যাপিয়া জীবিত ছিল। বিশ্বনাথ কাশীনাথ রাজবাড়ে সত্যই গর্ব করিয়াছেন “মারাঠারা তাহাদের বিজয়দুন্দু শ্বাটক হইতে কুমারিকা পর্যন্ত বাজাইয়াছিল।” ভারতের অন্তিম উত্তর-পূর্বে বঙ্গ, দক্ষিণ পশ্চিমে গোয়া পর্যন্ত মারাঠা-শক্তির তেজ্জ অনুভব করিয়াছিল।

তাহা ভিন্ন, আর একটা পার্থক্য আছে। শিখসংগঠন একটি ধর্ম-সম্প্রদায়ে রাজ্য, মারাঠা রাষ্ট্র একটি জাতি বা নেশনের সৃষ্টি, ইহা সর্ব ধর্মের, সর্ব জাতের বর্ণের মিলনের ফল। আর রাষ্ট্র-নীতি-শাস্ত্রের দিক দিয়া দেখিলে মারাঠা শাসন-পদ্ধতি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান শিখদের সৃষ্টি অপেক্ষা অনেক উচ্চ দরের ও অধিক কর্মক্ষম। শিখেরা যোদ্ধামাত্র ছিল, শাসনকর্তা নহে, কিন্তু মারাঠারা এ উভয় ক্ষেত্রেই অসম কৃতিত্ব দেখাইয়াছে।

কিন্তু যদিও মারাঠাদের উদয় মুঘল সাম্রাজ্যের অবনতির শেষ যুগে মাত্র ঘটয়া তথাপি উহারা অখ্যাত নগণ্য নবীন ভূইফোড় জাতি নহে। এই জাতির গরিব অতীত ইতিহাস ছিল। সম্ভবতঃ অশোক এবং খরবেলের শিলালেখের রাষ্ট্র জাতি মহারাষ্ট্র-বাসিগণ। তাহার পরবর্তী যুগে রাষ্ট্রকূট রাজগণ নিজেদের বিখ্যাত রাজ্য করিয়া উত্তর-ভারত পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাহারও পরে, যাদব বংশ মহারাষ্ট্র দেশ ব্যাপিয়া শেষ হিন্দুরাজ্য স্থাপন করেন, এবং এই বংশ মুসলমান আক্রমণে ন হইলেও, ইহার অনেক শাখা নানা স্থানে জমিদারের মত বহুদিন পর্যন্ত টিকিয়া থাকি। পূর্বপুরুষদের গৌরব-স্মৃতি জাগ্রত রাখিয়াছিল। যাদব বংশের এইরূপ একটি শাখা শিবাজীর মাতা জন্মগ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক গোবিন্দ সখারাম সরদেশাই বলেন যাদব এবং বিজয়নগর এই দুইটি স্বাধীন কিন্তু তৎকালে বিধ্বস্ত বিখ্যাত হিন্দু স্মৃতিই শিবাজীকে স্বাধীন স্বরাজ্য স্থাপন করিতে অনুপ্রাণিত করে। বিজয়নগরের সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। তাহার সহিত শিবাজীর সম্বন্ধ যোজনা করা কঠিন।

যাহা হউক, মারাঠা জাতি ও মারাঠা সরদার—স্বাধীন রাজা না হই অবহমান কাল হইতে ঐ দেশে ছিল। মারাঠা প্রধানগণ, তাহাদের মধ্যে কে রাজা বা সামন্ত পদ-বাচ্য, বহমানী সাম্রাজ্যের সময়ে এবং তৎপরে অহম

নিজামশাহী সুলতানদের সেনা-বিভাগে কাজ করেন এবং জাগীর ভোগ করেন। কিন্তু এসব বিক্ষিপ্ত, অপ্রধান, প্রায় অবজ্ঞিত মারাঠা সরদারগণ রাজ্যগঠনে অক্ষম ছিলেন, এবং সেরূপ কাজের কল্পনাও করেন নাই।

মুসলমান যুগে মারাঠা সামরিক শক্তির আদর এবং বুদ্ধি আরম্ভ হইল, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে, ঠিক আকবরের মৃত্যুর পর, যখন জাহাঙ্গীরের দুর্বলতার সুযোগ পাইয়া মালিক অম্বর অশেষ বাধা ও বিপত্তি জয় করিয়া নিজামশাহী রাজবংশকে খাড়া করিয়া রাখিলেন। বিজাপুরের সুলতান প্রথম প্রথম তাঁহার সহায়ক ছিলেন; অম্বর মুঘলদের সঙ্গে মহাযুদ্ধ করেন এবং এই সব যুদ্ধে মিতাহারী ক্রতগামী হালকা মারাঠা অশ্বরোহী সৈন্য লাগাইয়া মুঘলদের ভারি বর্ষাবৃত ধীরগামী বিলাসপ্রিয় অশ্বরোহী সৈন্যদের রোধ করিতে, তাহাদের রসদ লুটিতে এবং পথচলা বন্ধ করিতে সক্ষম হন। তখন মারাঠারা সেই নবী যুগেও নিজেদের যে একটা সামরিক মূল্য আছে তাহা প্রত্যক্ষ জানিতে পারিল। উচ্চ বেতন পাওয়ায় তাহাদের সরদারগণ নিজ নিজ অলুচর দলের সংখ্যাও ক্রমে বেশ বাড়াইলেন।

আর সেই সময়েই মারাঠা সরদারদের হাত করিয়া স্বপক্ষে আনিবার জন্য অহমদনগরের সুলতান এবং মুঘল বাদশাহর স্থানীয় প্রতিনিধির মধ্যে নিলাম চলিতে লাগিল। শাহজীর স্বস্তুর, শাহজীর খুড়া প্রভৃতি, এবং পরে স্বয়ং শাহজী একবার এপক্ষে যোগ দেন, আবার বেশী জাগীর ও টাকার প্রলোভনে ওপক্ষে সৈন্যদল লইয়া পার হন। এইরূপ কাজ জাহাঙ্গীরের, রাজ্যকালময় চলিয়াছিল। ফলে মারাঠা নেতা ক'জন অত্যন্ত বড় এবং দেশমাগ্ন হইয়া উঠিলেন, শাহজী তাহারই চরম সীমায় পৌঁছিয়া, মালিক অম্বর ও তাহার পুত্রের মৃত্যুর পর অহমদনগরের বিনষ্ট-প্রায় রাজবংশে 'কিং-মেকার' অর্থাৎ ইচ্ছামত রাজ-পুত্তলিকা-সৃষ্টিকর্তা হইয়া দাঁড়াইলেন; ঠিক মালিক অম্বরের পর শাহজীর মত কোন প্রবল ও প্রধান শত্রু মুঘলদের বিরুদ্ধে দাক্ষিণাত্যে মাথা তুলে নাই। সমস্ত দেশটা তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিত।

শাহজীর এই মহত্ব ১৬২২ হইতে ১৬৩৬ পর্যন্ত সাত বৎসর মাত্র ছিল। তাহার পর বাদশাহ শাহজহান স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে আসিয়া, তিনটি বৃহৎ সূচালিত সেনাদলের মিলিত চেষ্টার ফলে সব শত্রুকে দমন করিয়া, শাহজীকে প্রায় পথের ভিখারীর মত দশায় আনিয়া মহারাষ্ট্র হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

তাঁহার মহারাষ্ট্র দেশে রাজা হইবার আশা সমূলে নষ্ট হইল। তিনি পুণা জেলার জাগীর পুত্রকে দিয়া নিজে নিজামশাহী-রাজ্য ত্যাগ করিয়া বিজাপুর রাজের চাকরি লইলেন, এবং মহারাষ্ট্র হইতে অতিদূরে কর্ণাটক প্রদেশে—অর্থাৎ মহীশূর, আর্কট জেলা এবং বেলগাঁও অঞ্চলে, জাগীর অর্জন করিলেন। তিনি বিজাপুর রাজ্যে সর্বপ্রধান হিন্দু সামন্তের পদে উঠিলেন বটে, কিন্তু মহারাষ্ট্র দেশে তাঁহার কোন ক্ষমতাই রহিল না। স্বদেশে স্বরাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন যদি তাঁহার কখন ছিল, তবে তাহা ১৬৩৬ সালে একেবারে দূর হয়। একরূপ স্বরাজ্য-স্থাপন তাঁহার পুত্র শিবাজীর কীর্তি, সে কাহিনী আর একদিন বলিব।

কিন্তু মারাঠা জাতীয় অভ্যুদয়কে শুধু কোন মহাপুরুষের কর্ম বলিলে অসত্য হইবে। একথা মানি যে, মহাপুরুষ না জন্মিলে এই কার্য সফল হইত না, এবং যখন মহারাষ্ট্রের নেতাদের মধ্যে মহাপুরুষের অভাব হইল তখনই মারাঠা স্বাধীনতা অস্ত গেল। কিন্তু একথাও সমান সত্য যে জাতীয় জন-সমষ্টির মধ্যে কতকগুলি গুণ না থাকিলে, সমস্ত দেশময় একটা জাগরণ দেখা না দিলে, প্রবল মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মারাঠাদের পক্ষে স্বাধীনতা লাভ এবং সাম্রাজ্য-স্থাপন সম্ভব হইত না। দেড় শ বৎসরের রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব শক্তি শুধু একজন মানুষের উপর; মাত্র একপুরুষব্যাপী কর্মীর উপর, নির্ভর করিয়া টিকিতে পারে না,—যেমন রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর ছয় বৎসরের মধ্যে তাঁহার রাজ্য ধ্বংস হইল, কারণ শিখরাজ্য শুধু ব্যক্তিগত সৃষ্টি ছিল।

সুতরাং মারাঠাদের রাষ্ট্রীয় অভ্যুদয়ের বীজমূল হইতেছে মারাঠা জাতীয় চরিত্র। ইহাই আমরা এখানে ভাল করিয়া দেখিব। মারাঠা চরিত্রে আত্মনির্ভরতা, সাহস, অধ্যবসায়, কঠোর আড়ম্বর-শূন্যতা, সাদাসিধে ব্যবহার, সামাজিক সাম্য এবং প্রত্যেক মানবেরই আত্মসম্মানবোধ এবং স্বাধীনতাপ্রিয়তা, এই সব মহাগুণ জন্মিয়াছিল। তের শ বৎসর আগে চীনা পর্যটক ইউয়ান চুয়াং মারাঠা জাতিকে এইরূপই চক্ষে দেখিয়াছিলেন; তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—‘এই দেশের অধিবাসীরা তেজী ও যুদ্ধপ্রিয়; উপকার করিলে কৃতজ্ঞ থাকে; অপকার করিলে প্রতিহিংসা খোঁজে। কেহ বিপদে পড়িয়া আশ্রয় চাহিলে তাহারা তজ্জন্য ত্যাগস্বীকার করে, আর কেহ অপমান করিলে তাহাকে বধ না করিয়া ছাড়ে না।’

‘‘মারাঠা সৈন্যগণ সাহসী, বুদ্ধিমান এবং পরিশ্রমী, রাত্রে নিঃশব্দে আক্রমণ করা, অথবা শত্রুর জন্য ফাঁদ পাতিয়া লুকাইয়া থাকা, সেনাপতির মুখ না চাহিয়া নিজ বুদ্ধিবলে নিজকে বিপদ হইতে মুক্ত করা, এবং যুদ্ধের অবস্থা বদলানর সঙ্গে সঙ্গে রণ-প্রণালী বদলানর ক্ষমতা— একাধারে এই গুণগুলি একমাত্র আফগান এবং মারাঠা জাতি ভিন্ন এশিয়া মহাদেশে অন্য কোন জাতির নাই। ...স্বাধীনতার ফলে মহারাষ্ট্র দেশে জাতীয় শক্তি বিগুণ হইল এবং সামাজিক জীবন অধিকতর পবিত্র ও সরস হইল। দেশের ধর্মও এই সামাজিক সাম্যভাব বাড়াইয়া দিল। এইরূপে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দেখা গেল যে মহারাষ্ট্র দেশে ভাষায় ধর্মে চিন্তায় জীবনে এক আশ্চর্য একতা ও সাম্যের সৃষ্টি হইয়াছে। শুধু রাষ্ট্রীয় একতার অভাব ছিল; তাহাও পূরণ করিলেন শিবাজী।’’

উপরের কথাগুলি দ্বারা আমি অনেক পূর্বের এক গ্রন্থে মারাঠা চরিত্র-অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করি। একথাগুলি এখনও অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কিন্তু রাষ্ট্রগঠনের মত গুরুতর কার্যের পক্ষে এইসব ব্যক্তিগত গুণ ছাড়া আরও মূল্যবান কয়েকটি সুবিধা আবশ্যক; তাহা ছিল বলিয়াই মারাঠারা সফলতায় পৌঁছিতে পারিয়াছিল। সেই সুবিধাগুলির প্রথমে ইংরাজী নাম দিয়া পরে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিব—self-sufficing villages, experience of communal labour, local autonomy অর্থাৎ মহারাষ্ট্রে প্রত্যেক গ্রামে নানা বর্ণের নানা ধর্মের অধিবাসীরা একত্র মিলিয়া কর্মবিভাগ করিয়া লইয়া সমস্ত গ্রামের যাবতীয়

ব্যাপার সম্পন্ন করিত; রাজাকে গ্রামের মোট খাজানা দিয়াই তাহার। খালাস, আর সমস্ত রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যাপার তাহার। নিজেই সর্বোচ্চ অধিকারী রূপে নির্বাহ করিত, বাহিরের কাহারও মুখ চাহিয়া থাকিতে হইত না, বাহিরের কেহ গ্রামের জীবনে হস্তক্ষেপ করিতে পারিত না। এইগুলিকে Indian Village Communities বলা হয়, ইহার প্রত্যেকটি একটি ছোট প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রের মত, a petty republic. ইউরোপে মধ্যযুগের মাঝামাঝি এইরূপ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়; ইটালিতে এইরূপ নাগরিক গণতন্ত্র প্রচুর খ্যাতিলাভ করে, কিন্তু সেগুলি আকারে জন-সংখ্যায় এবং যুদ্ধবিগ্রহের ক্ষমতায় ছোট ছোট রাজ্যের সমান ছিল। মহারাষ্ট্রে প্রতি গ্রামে গ্রাম্য কর্মচারিগণের পদ পুরুষাত্মকমে চলিত, কখন কখন বা বিক্রয় হইত। কিন্তু তাহাতে গ্রামের জীবনযাত্রায় ব্যাধাত ঘটিত না। গ্রামবাসীরাই জুরী হইয়া ফৌজদারী বা দেওয়ানী মামলার নিষ্পত্তি করিত এবং জুরীর সিদ্ধান্তে সকলে সহি বা চোড়া দিয়া (নিরক্ষর লোকের পক্ষে লাঙ্গল বা ছোরার ছবি আঁকিয়া) তাহা দলিলে পরিণত করিত। এগুলির ফার্সী নাম মহজর-নামা। মধ্যযুগের ইংলণ্ডের গ্রাও জুরীর মত, কোন কোন মারাঠা মহজরে ৫০।৬০ জন লোকের স্বাক্ষর বা টীপ আছে।

সুতরাং প্রতি গ্রামই বাহিরের সঙ্গে সম্বন্ধ প্রায় ত্যাগ করিয়া নিজ গণ্ডীর মধ্যে বসিয়া থাকিয়া পুরুষাত্মকমে সময় কাটাইত। গ্রামের লোকজন দৈনিক স্বায়ত্তশাসন করিয়া করিয়া পাকা হইয়া গিয়াছিল। জনসংখ্যা একত্র হইয়া সাধারণের হিতকর কার্যগুলি কিরূপে করিতে হয় তাহার অভিজ্ঞতা এই জাতির গ্রামবাসীদের মজ্জাগত হইয়াছিল। সংগঠন বলিয়া যে একটা কথা আজকাল আমরা শুনিতেছি, তাহা মহারাষ্ট্রের গ্রামে গ্রামে অতি পুরাতন, অতি অভ্যস্ত জিনিষ ছিল। রাষ্ট্রশাসন ও নেশন-গঠনের পক্ষে ইহাই সর্বাপেক্ষা অধিক আবশ্যক ও শ্রেষ্ঠ উপকরণ। মহারাষ্ট্রে ইহা পূর্ণমাত্রায় ছিল। রোমক সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবার পর ইউরোপে এইরূপ কমিউন্ উদ্ভব হয়, তাহার বিবরণ Vinogradoffএর লেখায় সকলে জানিতে পারিবেন। কিন্তু তাহা মহারাষ্ট্রের মত বহু শতাব্দী ধরিয়া টেকে নাই।

এইরূপে মহারাষ্ট্রে সমাজ, নীচু হইতে গঠিত হইয়া উঠে। এইরূপ গঠনই স্থায়ী এবং লোকহিতকর। উপরের সর্বশক্তিমান কর্তা কোন মুসোলিনী বা আলাউদ্দীন খিলজী, হুকুম দিয়া সমস্ত দেশবাসীদের ক্রীতদাসের মত একটি পথবিশেষে চালাইলেন, ইহাতে নেশন গঠিত হয় না, এরূপ প্রতিষ্ঠান স্থায়ী হয় না—উহা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত জিনিষ। সে দুর্ভাগ্য মারাঠা জাতির হয় নাই; তাই আজ ব্রিটিশ-বিজয়ের পরও মারাঠা জাতি ভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ অগ্রসর জাতির সমকক্ষ হইয়া রহিয়াছে। প্রকৃত জনশক্তি ও সম্বলপ্রাণ কখনও বিলোপ পায় না।

এই ত গেল ঐ লোকদের জাতীয় চরিত্র, এখন ইতিহাসে ইহার ফল দেখা যাক। অতি আধুনিক মারাঠা লেখকগণ বলেন যে মহারাষ্ট্র দেশে হিন্দু স্বরাজ বা স্বাধীন মারাঠা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার কল্পনা ও চেষ্টা শাহজী হইতে আরম্ভ হয়, এবং শিবাজী পিতার এই নীতিটি

চুরি করিয়া তাঁহারই আরম্ভ কার্য সম্পূর্ণ করেন। কিন্তু শাহজীকে এই গৌরব দিতে ইতিহাস অস্বীকার করে। তিনি কোন বিষয়েই শিবাজীর পথ-প্রদর্শক ছিলেন না এবং অনেক বিষয়ে ঠিক বিপরীত। শিবাজীর কীর্তির মৌলিকতা অক্ষুণ্ণ রহিবে।

এখন দেখা যাউক, এই মারাঠা জাতিকে লইয়া শাহজী কি করিলেন। তাঁহার জীবনের প্রথমাংশে তিনি অহমদনগরের সুলতানদের কর্মচারী মাত্র ছিলেন, এবং সেই রাজবংশে অবনতি ধরিবার পর মালিক অম্বর যেমন একটা রাজপুত্রলিকা খাড়া করিয়া নিজে নামে রাজপ্রতিনিধি থাকিয়া কার্যতঃ সমস্ত রাজশক্তি চালাইতেন, সেই মত মালিক অম্বরের মৃত্যু হইলে শাহজীও অপর এক রাজপুত্রকে খাড়া করিয়া তাহার মাথায় রাজছত্র ধরিয়া, নিজে দেওয়ানরূপে যতটা পারিলেন দেশ শাসন করিতে লাগিলেন অর্থাৎ তিনি কখনও নিজেকে রাজা বা স্বাধীন শক্তি বলিয়া ঘোষণা করেন নাই, সর্বত্রই পরের চাকর এই আখ্যা দেন। আর তাঁহার জীবনের এই প্রথম অংশে (১৬২২-৩৫) তিনি মালিক অম্বরের মতই বিজাপুররাজ হইতে অনেক সাহায্য পান, এবং সেই সহায়তার বলেই নিজ নবজাত ক্ষুদ্র শক্তিকে মুঘল বাদশার বিরুদ্ধে খাড়া করিতে সাহসী হন।

শাহজহান স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে আসিয়া, মারাঠা নেতার এই চেষ্টা সমূলে নষ্ট করিয়া, তাঁহাকে জীবনের শেষ পর্যন্ত মহারাত্র হইতে বিতাড়িত ও কর্ণাটকে আবদ্ধ থাকিবার জন্ত সন্ধি করান (১৬৩৬ খৃঃ)। এই শেষ জীবনে (১৬৩৬-৬৪) শাহজী বিজাপুরের জাগীরদার মাত্র থাকিয়া প্রভুর নামে কর্ণাটকের নানা স্থান (তাঞ্জোর নহে—তাঁহার কর্তৃক তাঞ্জোর জয় হয় এটা পুরাতন ভ্রান্তবিশ্বাস) জয় করিয়া তাহার কিয়দংশ নিজ জাগীররূপে পান। কিন্তু এখনও তিনি চাকর মাত্র, স্বাধীন রাজা নহেন। এই সময়ে তাঁহাকে ঠিক গোলকুণ্ডার দেওয়ান মির জুমলার সমান পদস্থ বলিয়া বর্ণনা করিলে সত্য হইবে।

ফলতঃ, যদিও শাহজী শেষ বয়সে খুব ধনী ও ক্ষমতামণ্ডলী হন, যদিও মুরার জগদেবের মৃত্যুর পরে বিজাপুর সুলতানের রাজ্যে শাহজীই হিন্দু জাগীরদারদের মধ্যে সর্বপ্রথম বলিয়া গণ্য হন, যদিও তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র একোজী তাঞ্জোর রাজ্যের রাজা হন, তথাপি শাহজীকে হিন্দু-স্বরাজের প্রতিষ্ঠাতা, ছত্রপতিত্বের আদর্শ, বলিলে হাস্যাম্পদ হইতে হয়।

বিখ্যাত বিজয়নগর সাম্রাজ্য ১৫৬৫ সালের পর আরও সত্তর বৎসর হীন-প্রভায় ও খণ্ডকারে চলিতেছিল, কিন্তু ক্রমেই উহার রাজশক্তির দুর্বলতা, মণ্ডলদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ প্রভৃতি বাড়িয়া গিয়া উহার রক্ষা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। সুতরাং যখন শাহজহান ১৬৩৬ সালের সন্ধি দ্বারা বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানদের উত্তর ও পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইবার পথ বন্ধ করিয়া দিলেন, তখন এই দুইটি মুসলমান রাজার পক্ষে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে অভিযান পাঠাইয়া কর্ণাটক জয় করিয়া রাজ্য বিস্তার করা ভিন্ন অন্য কোন উপায় রহিল না। অর্থাৎ ভূতপূর্ব বিজয়নগর রাজ্যের খণ্ড প্রদেশগুলি লইয়া এই দুই সুলতানের মধ্যে কাড়াকাড়ি মারামারি এবং প্রভু মুঘলবাদশার নিকট কাঁদিয়া নালিশ করা আরম্ভ হইল। এই সব অভিযান ১৬৩৭ সাল হইতে ১৬৫০ সাল পর্যন্ত বেগে

চলিয়াছিল। তাহার পর বিজাপুর রাজশক্তিতে ঘুণ ধরিল, আদিলশাহী ক্ষমতা-বিস্তার মন্দ মন্দ গতিতে চলিয়া শেষে থামিয়া গেল; শুধু শাহজী মহীশূরে এবং অপর ক'জন সরদার পূর্ব-কর্ণাটকে অর্থাৎ আর্কট জেলা দুইটিতে কোন কোন স্থান জয় করিয়া জাগীর স্থাপন করিলেন। গোলকুণ্ডা রাজ্যেও মিরজুমলার কর্মত্যাগ (১৬৫৬), কুমার আওরংজীবের আক্রমণ এবং রাজপরিবারে কলহের ফলে বিজয়বাহিনী থামিয়া গেল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শাহজী কর্তৃক হিন্দু স্বরাজ স্থাপনের চেষ্টা ত হয়ই নাই, বরং তিনি হিন্দু সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশ লুণ্ঠ ও ভাগাভাগি কাজে স্থলতানদের অগ্ন্যাশ্রয় কর্মচারিগণের সহিত প্রচুর সহায়তা করেন। ইহাকে শিবাজীর জীবনের আদর্শ বলা যাইতে পারে না।

নিজ মহারাষ্ট্র দেশের সঙ্গে শাহজীর সম্বন্ধ প্রথম সামান্য মাত্র—অর্থাৎ মুসলমান স্থলতানের ভূতরূপে ছিল; এবং ১৬৩৬ হইতে এই সম্বন্ধ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়। তাঁহার জন্মভূমিতে শুধু দেড় লাখ টাকার জাগীর মাত্র অবশিষ্ট রহিল, তাহা তিনি পুত্র শিবাজীকে দিয়া চলিয়া গেলেন। জন্মভূমিতে তিনি কখনও নিজ মাথার উপর রাজছত্র ধারণ করেন নাই, জমিদার মাত্র ছিলেন; পুণা, চাকণ, স্থপা, বারামতী এই গ্রামগুলি তাঁহার থানা মাত্র ছিল, ১৬২৯—১৬৩৫ সালের মধ্যে তাঁহার অধিকার করা সব দুর্গ মুঘলেরা কাড়িয়া লইয়াছিল।

শাহজী ও শিবাজী যে এক মস্ত্রে অল্পপ্রাণিত হন নাই, তাঁহাদের জীবনের কাজ যে পৃথক পৃথক শ্রেণীর, তাহা একটি বিষয় ভাবিলেই স্পষ্ট হইবে। ১৬৫৪ সালের পর হইতে দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক গগনে মুঘল সূর্য অসহ্য দীপ্তিতে বিরাজমান ছিল, ছোটবড় সকলেই বুঝিল যে দিল্লীর বাদশাহই আমাদের সর্বসর্বা প্রভু, নামে অল্প কেহ স্থলতান হউন না কেন। শাহজী ১৬৩৬ সালের পর হইতে কখনও মুঘলদের সংঘর্ষে আসেন নাই, এমন কি বিজাপুর স্থলতানেরও বিরুদ্ধে কখনও দাঁড়ান নাই। এরূপ রাজভক্ত জাগীরদার কিরূপে বিদ্রোহী স্বাধীন শিবাজীর পথ-প্রদর্শক হইবেন?

সুতরাং “হিন্দবী স্বরাজ” শিবাজীর নিজস্ব কল্পনা, একমাত্র শিবাজীর সফল প্রচেষ্টা। তাহা শিবাজীর জীবন সম্যক্ আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারিব।

শ্রীযত্ননাথ সরকার

শিবাজী *

মহারাষ্ট্র দেশের সর্বজনপূজ্য সাধু রামদাস স্বামী নিজ দীর্ঘ জীবনের অন্তে তাঁহার শেষ পত্রে লিখিয়াছিলেন—

শিব রাজার রূপ অরূপ কর,
শিব রাজার দৃঢ় সাধনা অরূপ কর,
শিব রাজার কীর্তি অরূপ কর,
তুমিওলে।

সকল স্থখ ত্যজিয়া,
যোগ সাধন করিয়া,
রাজ্য সাধনায় তিনি কেমন

দ্রুত অগ্রসর হন।

শিব রাজাকে অরূপ রাখিও,
জীবনকে তুণ সমান মনে করিও,
[তবেই] ইহলোকে পরলোকে তরিবে,
কীর্তিরূপে।

আড়াই শ বৎসরেরও অধিক কাল হইল এই কথাগুলি লিখিত হয়, কিন্তু আজও বিপুল মারাঠা জাতীয় জনসমাজে ইহা জপ-মন্ত্র স্বরূপ হইয়া আছে। অন্তঃপ্রদেশীয় নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকও ইহার সত্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। ফলতঃ যদি আমরা শিবাজীর আরম্ভের পূজিপিটার সহিত তাঁহার জীবনশেষে সঞ্চিত কীর্তিকলাপ তুলনা করি, অথবা তাঁহার দেহত্যাগের পরও তাঁহার মৃত্যুহীন আত্মা ও স্মৃতির জীবন্ত প্রভাব অরূপ করি, তবে জগৎ ইতিহাসের সর্বোচ্চ কয়েকজন মহাপুরুষের মধ্যে তাঁহাকে স্থান দিতেই হইবে।

মারাঠাজাতির মধ্যে শিবাজীর স্মৃতি দেবতুল্য সম্মানের সহিত পূজা করা হয়। তাঁহার জাত অর্থাৎ বর্ণ ছিল মারাঠা; যদিও মারাঠাদের বড় লোকেরা ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করে, তথাপি ইহাদের অনেকে কৃষিজীবী বা গ্রহরীর কাজ করিয়া দিন কাটায়, এবং মারাঠা জাতের মধ্যে নিম্নশ্রেণীর লোকদের কুন্বী অর্থাৎ কৃষকের সমান বলিয়া সমাজে গণ্য করা হয়, এবং এই দুই জাতের আচার ব্যবহার প্রায় এক মতই।

ইহা সত্ত্বেও শিবাজীর কীর্তিকলাপ এত মহান যে এ প্রদেশের অহঙ্কারী ব্রাহ্মণ জাতও তাঁহাকে শিবের অবতার বলিয়া বর্ণনা করেন; তাঁহার তিরোধানের সময় অকালে সূর্যগ্রহণ ভূমিকম্প প্রভৃতি ঠিক যীশুর তিরোধানের মত, নৈসর্গিক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে বলিয়া প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে। মহারাণা প্রতাপসিংহের মতই শিবাজী এবং তাঁহার প্রধান অম্লচরগণ শত শত নাটক নভেল প্রণোদিত করিয়াছেন, এবং এখনও করিতেছেন। জাতীয় বীর, রাষ্ট্রনেতা, নেশান-গঠনকারী আদিপুরুষ, এই অভিধেয়ের প্রত্যেকটিই তাঁহার সম্বন্ধে অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

তাহার কার্যগুলির বিস্তারিত আলোচনা এবং সেই যুগের ভারতের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবস্থা চিন্তা করিলে, তবে তাহার অসাধারণ মহত্ত্ব ঠিক বুঝিতে পারা যায়। - ফলতঃ পুঙ্খকার ক্রমে ইতিহাসকে বদলাইয়া দিতে পারে, জনসম্মুখে নূতন পথে চালাইয়া দিতে পারে, ভারতে তাহার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত শিবাজী।

শিবাজীর ইতিহাসের কাঠামো অনেকদিন হইল আমাদের জানা আছে। গ্রান্ট ডফের গ্রন্থে যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহাই এতদিন নানা ভাষায় অনুবাদের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু গত উনিশ বৎসরের গবেষণার ফলে আমরা শিবাজীকে আরও সত্য, আরও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে পারিয়াছি। এখন আর গ্রান্ট ডফের কাহিনীতে সন্তুষ্ট থাকা চলে না। গ্রান্ট ডফের অজানিত কতকগুলি প্রথমশ্রেণীর মৌলিক উপাদান অতি অল্পদিন হইল আমাদের হস্তগত হওয়ায়, তাহার রচিত শিবাজী-চরিতে বিপ্লব-সমান পরিবর্তন ঘটাইয়া দিয়াছে। প্রথম আবিষ্কার, জয়পুরের মীর্জারাজা জয়সিংহের সমস্ত চিঠি-পত্র; ইহাতে ১৬৬৫-১৬৬৭ পর্যন্ত শিবাজীর কার্যকলাপ অতি বিস্তৃতভাবে প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় আমরা জানিয়াছি। দ্বিতীয়, কুমার আওরংজীবের মুন্সী কাবিলখার রচিত আদাব-ই-আলমগিরিতে ১৬৫৮ সাল পর্যন্ত এই মুঘল রাজকুমার এবং শাহজী ও শিবাজীর পরস্পর সম্বন্ধ বর্ণিত আছে। শিবাজী এবং তাহার কয়েকজন কর্মচারীর ফার্সী পত্র বিলাতের রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির এক হস্তলিপিতে পাওয়া গিয়াছে। বিজাপুরের সভাপণ্ডিত জহুর-বিন-জহুরীর মুহম্মদনামা এবং অনেকগুলি বিক্ষিপ্ত ফার্সী ফরমান ও সনদ আবিষ্কার হওয়ায়, শাহজী এবং তরুণ শিবাজীর ইতিহাস এখন সমসাময়িক দলিলের দৃঢ় ভিত্তিতে খাড়া করা যায়। পণ্ডিচেরীর প্রতিষ্ঠাতা ফ্রান্সোয়া মার্তী (Francois Martin) এর দিনলিপি হইতে মারাঠা বীরের কণ্ঠক অভিযানের বিস্তৃত বিবরণ এবং তাহার শিবিরের চাক্ষুষ বর্ণনা আমরা পাইয়াছি (প্যারিস হইতে নকল আনিয়া ১৯২৪ সালে আমি ইহা প্রথম প্রকাশ করি)। পত্নীগীজ ভাষায় গোয়া নগরে যে সব কাগজপত্র আছে তাহা নিঃশেষে খুঁজিয়া বাহির করিয়া ছাপিয়া, শ্রীযুক্ত পাণ্ডুরঙ্গ পিল্লেলেকর মহাশয় শিবাজীর জীবনের এই দিকটার উপর অনেক নূতন আলোক পাত করিয়াছেন। আর মারাঠা ভাষায় লিখিত জেধে বংশের শকাবলীতে আমরা সে সময়ের অনেক ঘটনার সঠিক তারিখ এবং সূক্ষ্ম বিবরণ—যদিও অল্প কথায়—পাইয়াছি। ইহা অমূল্য উপাদান। সংস্কৃতভাষায় তৎকালে লিখিত শিবভারতম্ পর্ণালপর্বতগ্রহণাখ্যানম্ এবং শিবরাজরাজ্য-ভিষেককল্পতরু এই তিনখানি ইতিহাস অল্পদিন হইল আবিষ্কৃত ও মুদ্রিত হইয়াছে। আর ফার্সী ভাষায় মাসির্-এ-আলমগীরী নামক সরকারী ইতিহাস ডফ সাহেবের অজ্ঞাত ছিল।

এই ত গেল নূতন আবিষ্কার। তাহার পর ডফের জানিত উপকরণ অধিক যত্নের সহিত নিঃশেষে ব্যবহার করিয়া, তিনি যাহা ছাড়িয়াছেন এরূপ অনেক কাজের কথা ও তারিখ পাওয়া গিয়াছে। এই উপকরণের মধ্যে দাক্ষিণাত্যের বন্দরের ইংরাজ ও ওলন্দেজ কুঠার পত্র, ভীমসেনের ফার্সী আত্মকাহিনীর মূল গ্রন্থ প্রভৃতি প্রধান। তথাকথিত “রায়গড় লাইফ অব শিবাজী” অর্থাৎ মালকরে বথরু; এটা এখন অগ্রান্ত উপাদানের সাহায্যে আমরা আগাগোড়া সংশোধন করিতে পারি। ইহার ফলে শিবাজীর ইতিহাস

একেবারে নূতন করিয়া গঠিত হইয়াছে। আমরা তাঁহার সত্যস্বরূপ এতদিনে চক্ষে দেখিতে পাইতেছি।

কিন্তু ইতিহাস ও জীবন কাহিনী একজন মানুষের বাহ্য আকার ও কর্মগুলি মাত্র আমাদের দেখায়। তাঁহার চরিত্র ও জীবনীশক্তির ক্রিয়া বুঝিতে হইলে এই সব বাহ্য ঘটনার উপর ঐতিহাসিক দর্শন, যাহাকে Philosophy of History বলে, তাহার প্রয়োগ করা আবশ্যক।

শিবাজীর চরিত্রের যে বর্ণনা আমি পূর্ব এক গ্রন্থে করিয়াছি, তাহাই সম্মুখে রাখিয়া সমালোচনা আরম্ভ করিব—

“আশ্চর্য সফলতা ও অতুলনীয় খ্যাতিতে মণ্ডিত হইয়া শিবাজী সেই যুগের ভারতে শর্বত্রই হিন্দুদের চক্ষে এক নূতন আশার উদাতারূপে দেখা দিলেন। একমাত্র তিনিই হিন্দুদের জাত ও তিলকের, শিখা ও উপবীতের রক্ষক ছিলেন।... তাঁহার চরিত্র নানা সদৃশ্যে ভূষিত ছিল। তাঁহার মাতৃভক্তি, সন্তানপ্রীতি, ইঞ্জিয়সংযম, ধর্মাল্লাস, সাধু-সন্তের প্রতি ভক্তি, বিলাস-বর্জন, শ্রমশীলতা এবং সর্ব সম্প্রদায়ের প্রতি উদারভাব সে যুগে অতুলনীয় ছিল।... তিনি সর্ব ধর্মের মন্দির ও শাস্ত্র গ্রন্থের প্রতি সম্মান এবং সাধু সজ্জনের পোষণ করিতেন।... সর্ব জাতি, সর্ব ধর্মসম্প্রদায়, তাঁহার রাজ্যে নিজ নিজ উপাসনার স্বাধীনতা এবং সংসারে উন্নতি করিবার সমান সুযোগ পাইত। দেশে শান্তি ও সুবিচার, স্ত্রীতির জয় এবং প্রজার ধনমান রক্ষা তাঁহারই দান।

“তাঁহার চরিত্রের আকর্ষণী শক্তি ছিল চুম্বকের মত—দেশের যত সং দক্ষ ও মহৎ লোক তাঁহার নিকট আসিয়া জুটিত।... সৈন্যদের সঙ্গে সদাসর্বদা মিলিয়া মিশিয়া, তাহাদের দুঃখকষ্ট বিপদের ভাগী হইয়া, ফরাসী সৈন্য মধ্য নেপোলিয়নের গ্রায় তিনি তাহাদের একাধারে বন্ধু ও উপাস্ত্র দেবতা হইয়া পড়েন।

সৈন্যবিভাগের বন্দোবস্তে, শৃঙ্খলা, দূরদর্শিতা, সর বিষয়ের সূক্ষ্মাংশের প্রতি দৃষ্টি, স্বহস্তে কর্মের নানা সূত্র একত্র ধরিবার ক্ষমতা, প্রকৃত চিন্তাশক্তি এবং অছটান-গঠনে নৈপুণ্য—এই সকল গুণের পরাকাষ্ঠা তিনি দেখান।.....

তাঁহার বংশধরগণ আজ জমিদার মাত্র। কিন্তু মারাঠা জাতিকে নবজীবন দান তাঁহার অমর কীর্তি।

ফলতঃ শিবাজী হিন্দু জাতির সর্বশেষ মৌলিক গঠন-কর্তা এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মবীর।” [আমার রচিত “শিবাজী”, ২৫২—২৬২]। এখানে এই পুনরাবৃত্তি শেষ করিলাম।

শিবাজীর কার্যগুলি এবং সেই যুগে দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক অবস্থা ভাবিয়া দেখিলে আমাদের প্রথম আশ্চর্যের বিষয় হয় শিবাজীর দৃষ্টিশক্তি। তখন রাজনৈতিক গগন অন্ধকার, চারিদিকে ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন, অথচ তিনি যেন দৈবজ্ঞানে বুঝিতে পারিতেন কোন্ ঘটনার কি ফল হইবে, শক্তিগুলির মিলন বা সংঘর্ষ কোন্ দিকে গড়াইবে। তিনি কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার সময় তরুণ যুবক ছিলেন, কোন বড় শহর বা রাজসভা দেখেন

নাই; ছোট খণ্ড খণ্ড জাগীরে আমলাগিরি করিয়া শাসন ও যুদ্ধের যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, এমন কি পুস্তক পড়িবার বিদ্যাও শিক্ষা করেন নাই, তাহার জ্ঞান অবসরও পান নাই। তথাপি তিনি চারিদিকে প্রবল পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বীকে আক্রমণ করিতে, অথবা সময় বুঝিয়া মৈত্রী করিতে, দ্বিধা বোধ করেন নাই। কোন ভুলের চাল চালেন নাই। লোকে ভাবিত ইহা তাঁহার ইষ্টদেবী ভবানীর মন্ত্রণা বা স্বপ্নাদেশের ফল। আমরা বলিব ঈশ্বরদত্ত প্রতিভা। জগতের সব দেশেই সর্বোচ্চ শ্রেণীর কর্মবীরগণ এই নিভুল দূরদর্শিতা দেখাইয়া থাকেন; সাধারণ প্রতিভার লোক, হাজার স্ববুদ্ধি সং বা কর্মঠ হউক না কেন, এই মহাশক্তিতে বঞ্চিত। অর্থাৎ ইংরাজীতে genius এবং talent এর মধ্যে যে পার্থক্য করা হয় তাহা ইহাই।

তাঁহার পর, প্রকৃত রাজার, সর্বোচ্চ শ্রেণীর লোকনায়কের প্রধান চিহ্ন, লোক চিনিবার শক্তি, অর্থাৎ প্রত্যেক লোকের ঠিক চরিত্র এবং কর্মকুশলতা অথবা বিশেষ গুণগুলি অতি অল্প সময়ে দৈবজ্ঞের মত ঠিক বুঝিয়া লইতে পারা। এই গুণে শিবাজী এবং তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী আওরঞ্জীব বাদশাহ অতুলনীয় ছিলেন। এইরূপে লোকচরিত্র নিভুল বিচার করিয়া তিনি প্রত্যেক কর্মচারীকে তাহার ব্যক্তিগত উপযুক্ত কাজে নিযুক্ত করিতেন, অর্থাৎ ইংরাজী উপমায় যে বলে গোল খুঁটোকে চৌকোণা গর্তে বসাইও না, শিবাজী কখনও সেরূপ ভুল করিতেন না। ইহাও একটি দৈবশক্তি এবং জগতে সফলতা লাভের একটি প্রধান মন্ত্র।

প্রভুর পক্ষে সফলতার আর একটি মন্ত্র এই যে, সব শ্রেণীর কর্মচারীর শ্রমের সামঞ্জস্য করিয়া, তাহাদের বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত চেষ্টাকে সমবায়ের সূত্রে গাঁথিয়া দিয়া, সেই সূত্রে সর্বদা নিজ হাতে রাখিয়া অতি অল্প ব্যয়ে ও অতি অল্প বাধাতে কাজ হাসিল করা। শিবাজী সব শ্রেণীর সেবকের নিকট হইতে প্রফুল্লবদনে প্রদত্ত ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ সেবা ও শ্রম আদায় করিবার গোপনীয় মন্ত্রটি জানিতেন। যিনি প্রকৃত লোকনেতা কেবল তিনিই এইরূপ করিতে পারেন। তিনি নিজে খাটেন এবং অতীত খাটাইতে জানেন, নিজে খাটেন সর্বদা সজাগ পর্যবেক্ষণে এবং ভৃত্যদের কাজের সম্বন্ধে—ভৃত্যদের কাজ নিজে হাতে করিয়া নহে। শেষোক্ত ভুলটি অর্থাৎ সব কাজ নিজে করিব বা চালাইব, স্থানীয় প্রতিনিধির হাতে কিছুমাত্র দায়িত্ব দিব না, এই মহাভ্রান্তিপূর্ণ নীতি অনুসরণের ফলে দ্বিতীয় ফিলিপ, আওরঞ্জীব এবং আমাদের বড়লাট লর্ড কেনিংএর শাসন বিফলতার মধ্যে ডুবিয়া যায়, অথচ তাঁহারা প্রত্যেকেই সচ্চরিত্র বুদ্ধিমান এবং শ্রমী শাসক ছিলেন। শিবাজী কিন্তু নিজের কোন ভৃত্যকে তাঁহার উপর প্রভু হইয়া বসিয়া তাঁহার কার্য পরিচালনা করিতে দিতেন না, কারণ তিনি নিজেই সর্বত্র কর্তা, সর্বত্রই পরিদর্শক হইয়া থাকিতেন। দৌলত রাও সিন্ধিয়ার ফিরঙ্গী সেনাপতিগণ প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার প্রভু হইয়া দাঁড়ায়, কারণ দৌলত রাও নিজে অকর্মণ্য নিবোধ অলস। শিবাজী ইহার বিপরীত ছিলেন। তিনি আশ্চর্য প্রতিভাবলে বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন জাতের বিভিন্ন প্রদেশের সেনানী ও আমলাকে খাটাইতেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে রেশাশেনী সংঘর্ষ বা স্ব স্ব প্রধানতা প্রবল

হইতে দিতেন না। দেশস্থ, কর্হাড়ে, শেনবী, চিংপাবন এই চারি শ্রেণীর পৃথক ব্রাহ্মণ, মসীজীবী, প্রভু-কায়স্থগণ, জাত মারাঠাগণ, এমন কি নাপিত, বণিক, গুজর, এবং মুসলমান পর্যন্ত তাঁহার শাসনবিভাগে ও সৈন্যদলে কাজ করিত, কিন্তু প্রত্যেকেই স্ব স্ব স্থানে থাকিয়া এবং প্রভুকে মানিয়া চলিয়া। তাঁহার পরবর্তী যুগে যখন মারাঠা রাজ্যে কর্মচারীদের মধ্যে স্বেচ্ছাচার আরম্ভ হইল, প্রভুর শক্তি অবহেলা ও অগ্রাহ্যের বিষয় হইয়া দাঁড়াইল, তখন সেই সোনার রাজত্ব ভাঙিয়া গেল। অরাজকতা উপর হইতে নীচে আসিয়া পৌছিল—ঠিক যেমন রণজিৎ সিংহের অযোগ্য পুত্রদের সময়ে পঞ্জাবে ঘটয়াছিল।

সবার উপর শিবাজীর রাজনৈতিক অনুভব-শক্তিকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। নব্য ইটালীর একতা-বন্ধনের এবং স্বাধীনতা-লাভের পুরোহিত কাউন্ট কাভুর বলিতেন যে শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ কম্বীরের লক্ষণ হচ্ছে এই যে কোন্ কাজটা সম্ভব তাহা দৈবজ্ঞের মত বুঝিতে পারা—বিনা তর্কে, বিনা চিন্তায়, স্বভাবসিদ্ধ শক্তির দ্বারা,—যেমন হাঁসের বাচ্চা জন্মিয়াই সাতার দিতে পারে। এই শক্তির অভাবে অনেক নীতিশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, সাধু শাসক, মহারথী তলাইয়া যান, প্রকৃত কার্যক্ষেত্রের পরীক্ষায় হার মানেন। এই দিক দিয়া দেখিলে শিবাজীকে প্রথম শ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞ অথবা ষ্টেটসম্যান বলিতে হইবে। আপনারা জানেন জিনিয়াস্ এবং ট্যালেন্ট এই গুণ দুটির মধ্যে যে পার্থক্য আছে, ঠিক সেই পার্থক্য ষ্টেটসম্যান এবং পলিটিশিয়ানের মধ্যে আছে। শিবাজী প্রকৃতই ষ্টেটসম্যান ছিলেন—যেমন ফরাসী রাজা চতুর্থ হেনরী অথবা ইংলণ্ডের প্রথম এডওয়ার্ড ও এলিজাবেথ।

আবার প্রকৃত কম্বীরের মত তিনি কোন নূতন কাজ বা নূতন অভিযান আরম্ভ করিবার পূর্বে জমি পরিষ্কার করিয়া পথ বাঁধিয়া তবে অগ্রসর হইতেন; এই যেমন সুরট বন্দর লুটিবার অথবা বেরার প্রদেশ প্রথমবার আক্রমণ করিবার পূর্বে। তিনি অনেক মাস ধরিয়া সেই সেই স্থানে চর পাঠাইয়া সব গোপনীয় তথ্য ও পথঘাট জানিয়া, এবং সেখানে উপস্থিত হইবার পর তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য আগে হইতে গুপ্ত প্রতিনিধি বসাইয়া রাখিয়া, তবে নিজ দেশ হইতে যাত্রা করিতেন, এবং এইরূপ স্থানীয় জ্ঞান ও সহায়কের যোগাযোগে তাঁহার কর্মঠ মিতাহারী আস্বাববিহীন অশ্বারোহী দল লইয়া এত দ্রুত অগ্রসর হইতেন যে শত্রুগণ তাঁহার পৌছার পূর্বে সতর্ক হইতে পারিত না, ভাবিত যে শিবাজীর বগীরা আকাশ হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছে। বেরারের সর্বাপেক্ষা ধনশালী শহর কারঞ্জা যখন শিবাজী প্রথম লুণ্ঠ করিলেন, তখন অতি প্রত্যুষে শহরবাসীরা ঘুম হইতে জাগিয়া দেখিল যে যাহা কোনদিন শুনে নাই, ভাবে নাই সেই ঘটনা ঘটয়াছে, মারাঠা সৈন্যের উপস্থিতি ২০০ মাইলের মধ্যেও শুনা যায় নাই, অথচ তাহারা রাতারাতি পৌছিয়া ঐ শহর ঘিরিয়া ফেলিয়াছে।

ফলতঃ শিবাজীকে শুধু বীর যোদ্ধা বা বিচক্ষণ সেনানায়ক ভাবিলে ভুল হইবে। তিনি এই মহাগুণের সঙ্গে সঙ্গে দৌত্যকুশলতা এবং শাসন-দক্ষতা এই দুটি বিপরীত শ্রেণীর গুণেও ভূষিত ছিলেন। ইংলণ্ডের ইতিহাসে ক্রমওয়েল ও মালবরো, ওয়েলিংটন এবং পঞ্চম হেনরী মাত্র এই আশ্চর্য গুণ সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত। ভারতে আকবর।

এইত শিবাজী চরিত্রের বিশ্লেষণ। এখন দেখা যাউক তাঁহার কীর্তিগুলি কি কি। আমি এখানে তাঁহার জয়-পরাজয়, ধন-দৌলত বা রাজ্যবিস্তারের বিবরণ দিব না, তাহা আপনারা সকলেই অল্পবিস্তর জানেন, এবং আমি এক বাদালা গ্রন্থে প্রকাশিত করিয়াছি। আজ দেখাইব তিনি মারাঠা জাতির জন্য নূতন কি করিলেন, তাঁহার দান কি কি।

শিবাজীর শ্রেষ্ঠ কীর্তি হইতেছে মারাঠাদের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা, তাহাদিগকে একতার সূত্রে গাঁথিয়া দিয়া নেশান্-সৃষ্টির আরম্ভ করা। এরূপ কার্য জগতের ইতিহাসে প্রায়শঃ নূতন ধর্মপ্রবর্তকেরাই করিয়া থাকেন, কচিং কোন কোন দেশে এক একজন মহাপুরুষ নেতা বা অসামান্য রাজনৈতিক প্রতিভাশালী পুরুষ করিতে পারেন। শিবাজী এই শ্রেণীর নরশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ ছিলেন, তাই আজও তাঁহার নাম মহারাষ্ট্রে এবং মারাঠাজাতির গুণগ্রাহী অল্প প্রদেশের অধিবাসীর মধ্যে দেবতার সমান পূজা করা হয়। তাই আজও তাঁহার স্মৃতি রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিষ্ঠানগুলিকে লোকে এত যত্নের সহিত আলোচনা করে এবং অনেকে আদর্শ বলিয়া অনুসরণ করিতে চায়। তিনি প্রথমে মারাঠাদিগকে বুঝাইলেন “মালুঘ আমরা, নহি ত মেঘ”, কার্যদ্বারা প্রমাণ করিলেন যে তাহারা এই নবায়ুগেও রাজ্যগঠন করিতে, শাসন চালাইতে, প্রতিদ্বন্দ্বী সহ সমকক্ষ হইতে পারে, তাহাদের উন্নতি সম্ভব এবং সে উন্নতিলাভ করা তাহাদের নিজের হাতেই। যুগ যুগ বহিয়া অধীনতা ও জাতীয় অবসাদের ফলে যে নৈরাশ্র জন্মে তাহা দূর করিয়া একটা রাষ্ট্রের মৃতদেহে নবীন প্রাণ সঞ্চার করার মত বড় কাজ জগতে আর নাই। শিবাজী তাহাই করেন, এবং তিনি মারাঠা জাতির মধ্যে যে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন তাহা এখনও চলিতেছে—সমগ্র ভারতের চক্ষে দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

চলিত কথায় বলা যাইতে পারে যে শিবাজী প্রথমে মারাঠা জাতির—এবং দৃষ্টান্ত দ্বারা অল্প প্রদেশের হিন্দু প্রজাদেরও ভয় ভাঙাইলেন। তিনি যখন ক্ষুদ্র জমিদার হইয়াও স্বাধীনতার পথে প্রথম পা ফেলিলেন (১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে) তখন তাঁহার উপরের শক্তি, অর্থাৎ বিজাপুর-রাজ, বাহতঃ অক্ষুণ্ণ প্রতাপে, আর রাজার উপর রাজা অর্থাৎ দিল্লীর বাদশাহ মধ্যাহ্নের সূর্যের মত সমস্ত ভারতকে উদ্ভূত করিতেছিল। এই মুঘল রাজশক্তির সমক্ষে ভারতের সব হিন্দু-মুসলমান রাজ্যগুলি হার মানিয়াছিল, এমন কি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার এতদিনকার স্বাধীন মুসলমান সুলতান দুটিও দিল্লীশ্বরের নিকট মাথা নত করিয়া নিজদের তাঁহারই সামন্ত মাত্র বলিয়া মানিয়া লইয়া, দিল্লীর বাদশাহের নাম নিজ নিজ রাজধানীতে খুঁবা পাঠের অন্তর্গত করিয়া দিয়াছিলেন, আর অহঙ্কারী দিল্লীশ্বর এই দুই সুলতানকে চিঠি-পত্রে শাহ অর্থাৎ রাজা না বলিয়া থা অর্থাৎ সম্রাট প্রজা এই নাম দিয়া লিখিতেন,—আদিল থা, কুতব থা, ঠিক যেন মুঘল সরকারের চাকর থা জহান বা থা দৌরানের মত।

অথচ এই মুঘল চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে প্রথম দাঁড়াইলেন, তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে অপমান করিলেন, কে? একটি ত্রিশ বৎসর বয়স্ক যুবক, পরাজিত, নির্বাসিত জাগীরদারের ছেলে, যাহার আয় তখন তিন লক্ষ টাকার বেশী হইবে না। সমস্ত ভারত বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া এই দৃশ্য দেখিল। ইহা শিবাজীর ভবিষ্যৎ দৃষ্টির অপূর্ব দৃষ্টান্ত।

এইরূপ দুৰূহ, প্রায় অসাধ্য, কাজে সফল হওয়াই তাঁহার দেবদত্ত প্রতিভার প্রমাণ। জগতে নূতন পথ, নূতন দেশ আবিষ্কারকের যে মান, রাজনৈতিক ভারতে শিবাজীর তাহাই প্রাপ্য।

তাঁহার পর কখনও দুই শত্ৰুর, কখনও বা তিন শত্ৰুর—মুঘল, বিজাপুর, পোতুগীজ, ইংরাজ—ইহাদের একসঙ্গে আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া তিনি দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন—এই সব দ্বন্দ্বে তাঁহার কত বুদ্ধির স্থিরতা, হৃদয়ের দৃঢ়তা এবং উপায় উদ্ভাবনে বিচিত্র মৌলিকতা দেখা গিয়াছিল, তাহা তাঁহার ইতিহাস পাঠকেরাই জানেন। ঠিক কখন বা কাহার সহিত মৈত্রী করিতে হইবে, অথবা যুদ্ধ আরম্ভ লাভকর হইবে, তাহা তিনি অব্যর্থভাবে বুঝিতে পারিতেন। ভারতে এরূপ চির-সফল সুবিধাবাদী unfailing opportunist আর দেখা যায় না।

তাঁহার এই সুবিধার পন্থা দেখিয়া বাহির করিবার, রন্ধ্রে প্রহার করিবার দৈবশক্তি তাঁহার বিখ্যাত কর্ণাটক অভিযানে অতি উজ্জলভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। মারাঠা খবর-কার এই সেনাচালনকে “ছত্রপতির দক্ষিণ দিগ্বিজয়” নাম দিয়াছেন, এবং একজন ইংরাজ প্রত্যক্ষদ্রষ্টা বণিকের বর্ণনায় আছে যে “জুলিয়াস সিজারের মত শিবাজী সেই প্রদেশে আসিলেন, দেখিলেন ও জয় করিলেন”; ইহাই তাঁহার যথার্থ বর্ণনা। কত রাজনৈতিক ফন্দী, সন্ধি পাতান, মুঘল সুবাদারকে ঘুষ দেওয়া, চর পাঠাইয়া সব খবর লওয়া, ঘাটিতে ঘাটিতে নিজ লোক আগে হইতে গোপনে প্রস্তুত রাখা, এই অভিযানের পূর্বে সম্পন্ন করিয়া তবে শিবাজী একপদও অগ্রসর হন, এবং এইরূপ দূরদর্শিতার সহিত বন্দোবস্তের ফলে তাঁহার গতি যে কেমন অবাধ ছিল, কাজটা কত শীঘ্র সম্পন্ন হইল তাহা শিবাজী-চরিত্রের এই অধ্যায়ে আপনারা অনেকই পড়িয়াছেন।

শত্ৰুরা শিবাজীকে লুটিয়াই বলুক, আর পার্বত্য মুখিকই বলুক, তাঁহার সফলতা ও শক্তিকে অস্বীকার করিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না। স্বয়ং আওরংজীব ১৬৬৭ সালে তাঁহার ‘রাজা’ উপাধি অল্পমোদিত করেন এবং ১৬৭৪ সালে শিবাজী মহাসমারোহে রাজ্যাভিষেক করিয়া সমগ্র ভারতের সম্মুখে নিজকে ছত্রপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন, নিজ নামে টাকা বাহির করিলেন, এবং সেইদিন হইতে এক রাজ্যাভিষেক শক প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

ইহাই ত গেল তাঁহার গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে উঠিবার পথের সোপানাবলী। তাঁহার পর তাঁহার প্রতিষ্ঠানগুলি আলোচনা করিয়া বক্তব্য শেষ করিব।

তাঁহার শাসনপ্রণালী সে যুগের এবং সে দেশের সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল, এবং ঐ দেশের পূর্ব সংস্কার ও অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপরে গঠিত—বিদেশ হইতে কলে ঢালা দ্রব্যের আমদানী নয়—এজ্ঞা উহা বেশ সুফল প্রদান করে এবং প্রায় শেষ পর্যন্ত টেকে। পরবর্তী রাজাদের চরিত্রহীনতার এবং মন্ত্রীদের মধ্যে বাগড়ার ফলেই এই শাসন-প্রণালী পরে ভাঙ্গিয়া পড়ে—পরিকল্পনার দোষে নহে। শিবাজীর রাষ্ট্রশাসন-পদ্ধতিতে অষ্টপ্রধানদের পদ ও কার্যবিভাগ আপনারা জানেন।

শিবাজীর নূতন সৃষ্টি—প্রায় আমাদের বিশ্বাসের অতীত—তাঁহার নৌসেনাগঠন।

যখন তিনি কল্যাণ (বর্তমান থানা জেলা, বম্বে দ্বীপের ঠিক পূর্বে স্থিত স্থলভূমি) অধিকার করিয়া সমুদ্রগামী জাহাজ গড়িতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাহা দেখিয়া গোয়া ও দামনে পত্নীগীজদের ভয় জন্মিল। আপনারা গুনিয়া বিশ্বাস করিবেন না যে শিবাজী ও বম্বের ইংরাজদের মধ্যে সর্ব প্রথম যে জলযুদ্ধ ঘটে তাহাতে ইংরাজের পরাজয় হয়।

শিবাজীর সৈন্যগঠন ও নেতৃত্বের প্রশংসা করা অনাবশ্যক, কারণ মারাঠা শক্তির অদম্য বিকাশ এবং ভারতবাসী প্রভাবই ইহার সাক্ষ্য। এই সৈন্যগণকে শুধু বর্গী ভাবিলে ভুল হইবে। একজন উত্তর-ভারতীয় মুসলমান ঐতিহাসিক মার্বহাট্টা শব্দের ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন “মার্বকে হট গিয়া!” অর্থাৎ যাহারা হঠাৎ ঘোড়া ছুটাইয়া আসিয়া ছু চার ঘা মারিয়া ছু চারটা জিনিষ লুঠ করিয়া, বিপক্ষ সৈন্য আসিতেছে শুনা মাত্র পলাইয়া যায়। কিন্তু শিবাজীর সময়ে মারাঠা সৈন্য ইহার অপেক্ষা অনেক উচ্চ শ্রেণীর সামরিক শক্তি দেখায়। তাহারা মুঘল সেনাপতি ইখলাস খাকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাস্ত করে, অনেক দুর্গ প্রকাশে অবরোধ করিয়া জয় করে, এবং প্রবল দল লইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সহস্রাধিক মাইল পথ কুচ করিয়া যায়। এগুলি লুটিয়ার কাজ নহে।

শিবাজীর রাজ-সভা দেশের—শুধু মহারাষ্ট্রের নয়, সমস্ত ভারতের—গুণী জ্ঞানী শিল্পী ভক্ত জনগণকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিল। তাহারই অল্পগ্রহে দেশে জ্ঞান ও ধর্ম আবার আলোক দিতে আরম্ভ করিল। ইহাও লুটিয়ার কাজ নহে।

সর্বশেষে এই নিষ্ঠাবান হিন্দু নরগতি সর্ব ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতি, সর্বধর্মের মন্দির ও শাস্ত্রগ্রন্থের প্রতি সম্মান, সর্বজাতির সাধু পুরুষদের আদর ও অর্থ এবং লাখরাজ জমি দান প্রভৃতি কাজের দ্বারা সেই যুগে এক অশ্রুতপূর্ব মহত্বের দৃষ্টান্ত দিয়া গিয়াছিলেন। সে দৃষ্টান্তের অভাব আজ জার্মানী অল্পভব করিতেছে। শিবাজীর দর্শিত আদর্শকে ভুলিয়া যাইবার ফলে আজও ভারতে ধর্মের দোহাই দিয়া নরহত্যা ও গৃহদাহ চলিতেছে। তাই রামদাসের ভাষায় আজও বলা আবশ্যক—“শিবরাজাস্ আঠবার্বে”—

‘শিবাজীকে স্মরণ রাখিবে’।

শ্রীযত্ননাথ সরকার

শিবাজীর পর মারাঠা-ইতিহাসের ধারা *

আমি পূর্বের দিন দেখাইয়াছি যে গ্রাণ্ট ডফ-রচিত এবং এতকাল সর্বত্র গৃহীত শিবাজীর ইতিহাস-কাহিনীতে গত ১২ বৎসরে আমূল পরিবর্তন হইয়াছে। তাঁহার দুই পুত্র—শম্ভুজী ও রাজারামের ইতিহাসেও, আধুনিক গবেষণার ফলে ঠিক সেই পরিমাণে অতি মূল্যবান সংশোধন আমরা এখন করিতে পারিয়াছি। আমাদের প্রাপ্ত, কিন্তু ডফের অজ্ঞাত অথবা যৎসামান্য ব্যবহৃত, উপাদানগুলি এই :—

(১) শম্ভুজী কর্তৃক সাষ্টি (Salsette) আক্রমণের পতুগীজ ভাষায় লিখিত অতি দীর্ঘ বিবরণ; ইহার একটা ইংরাজী অনুবাদও লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসে আছে।

(২) আওরঙ্গজীবের পুত্র কুমার আকবর বিদ্রোহী ও পলাতক হইয়া মারাঠা রাজার আশ্রয়ে থাকিবার সময় তাঁহার লিখিত ফার্সী পত্রগুলি (লণ্ডনের রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকালয়ের হস্তলিপি)।

(৩) এই আকবর ও গোয়ার কর্মচারীদের মধ্যে যে পত্রের আদানপ্রদান হয় তাহা এবং পোতুগীজ সরকারী দলিলাদি খুঁজিয়া বাহির করিয়া গোয়া-নিবাসী গোঁড় সারস্বত ব্রাহ্মণ পাণ্ডুরঙ্গ পিন্সলেকের অল্পদিন হইল ছাপাইয়াছেন।

(৪) পণ্ডিচেরীর প্রতিষ্ঠাতা ফ্রাঁসোয়া মার্তীর দিনলিপি; ইহাতে ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মাদ্রাজ কর্ণাটকের বিস্তৃত সমসাময়িক বিবরণ পাওয়া যায়। তিনটি বৃহৎ ভলুমে অল্পদিন হইল ইহা সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

(৫) ঐতিহাসিক অর্মের নকল করা কতকগুলি খাতা। ইহাতে ইংরাজকুঠার যে সকল কাগজ নকল করা হয় তাহার আসলগুলি অনেকস্থলে এখন লোপ পাইয়াছে। এই কাগজগুলি হইতে শম্ভুজীর রাজত্বের প্রথম দুই বৎসরের বিস্তৃত ও বিস্তৃত বিবরণ এখন রচনা করা যায়। গ্রাণ্ট ডফ যে চিটনিস বথরের উপর অন্ধভাবে নির্ভর করিয়া এই দুই রাজার ইতিহাস লেখেন, তাহা অতি আধুনিক এবং প্রবাদমূলক, ১৮০৯ সালে রচিত। উপরের বর্ণিত উপকরণ হইতে ডফ এবং চিটনিসের অসংখ্য ভুল ঘটনা ও তারিখ সংশোধন করিয়া ঐ সময়কার বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস গঠন করা এখন সম্ভব হইয়াছে। এই সংশোধনের ফল আমার ইংরাজী আওরঙ্গজীব গ্রন্থের চতুর্থ ভলুমে (দ্বিতীয় সংস্করণে) পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি।

(৬) আওরঙ্গজীবের যুগের সমসাময়িক ফার্সী হস্তলিখিত ইতিহাস ও পত্রাবলীর সাহায্যে রাজারামের বিস্তৃত ও বিস্তৃত ইতিহাস আমার আওরঙ্গজীব-গ্রন্থের পঞ্চম ভলুমে দিয়াছি। এই সব মালমসলা গ্রাণ্ট ডফের অজ্ঞাত ছিল, এবং এগুলির ব্যবহারের ফলে ১৬৮০ হইতে ১৭০০ এই বিশ বৎসরের মারাঠা ইতিহাস এক নূতন কলেবর ধারণ করিয়াছে।

* ১৩৪২, ৮ই চৈত্র তারিখে পরিষদমন্দিরে প্রদত্ত অধরচক্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতামালার তৃতীয় ও শেষ বক্তৃতা।

তাহার পর, অষ্টাদশ শতাব্দীতে পৌছিয়া, মারাঠা ইতিহাসের অতি বহুল সংখ্যক এবং অমূল্য প্রাথমিক উপাদান আমরা গত ৩০।৩৫ বৎসরের মধ্যে পাইয়াছি; ইহার সবই গ্রাণ্ট ডফের পরে আবিষ্কৃত। এগুলি মারাঠা সরকারী চিঠি, অথবা দূত ও সেনাপতিদের রিপোর্ট এবং নিজস্ব পত্র। দাক্ষিণাত্যের আজন্ম ইতিহাস-সেবক রাজবাড়ে, সানে, পারসনিস, থরে, সরদেশাই প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই শ্রেণীর উপকরণ সংগ্রহ করিয়া প্রায় এক শত ভলুম ছাপিয়াছেন। তাহার পর, বম্বে গভর্ণমেন্ট নিজহস্তে স্থিত পেশোয়া-দপ্তরের সব কাগজপত্র খুঁজিয়া বাছিয়া ৪৫ ভলুম ঐতিহাসিক পত্র ও হিসাব, সরদেশাই মহাশয়ের সম্পাদকতায় প্রকাশিত করিয়াছেন। এ সব উপকরণ মারাঠা ভাষায় লিখিত। এ ভিন্ন অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতের অনেক অপ্রকাশিত ফারসী ইতিহাস এখন আমাদের হাতে আসায়, উত্তর-ভারত ও রাজপুতানায় মারাঠা জাতির ক্রিয়াকলাপ এবং পাণিপথের শেষ যুদ্ধের বিষয়ে অনেক অমূল্য সমসাময়িক বিবরণ নূতন জানা গিয়াছে এবং সেই যুগের ইতিহাস পূর্ণতর হইয়াছে।

অনেকেই জানিতে চান যে, এই পেশোয়া-দপ্তরের মত সমৃদ্ধ মন্ডন করিয়া, সাতাইশ হাজার বাণ্ডলের প্রায় তিন কোটি কাগজখণ্ড ঘাঁটিয়া যে ৪৫ ভলুম-ব্যাপী চিঠিপত্র ছাপান হইল, তাহাতে মারাঠা ইতিহাসের নূতন কি কি তথ্য পাওয়া গেল। এই প্রশ্নের উত্তর অল্প কথায় দেওয়া কঠিন; ভারত ইতিহাসের এই শাখা ষাঁহার বিশেষ ভাবে চর্চা করিয়াছেন, তাঁহাদের কতকটা বুঝান যায়। আমি সংক্ষেপে ইহার আভাস দিতেছি:—

- পেশোয়া-দপ্তরে এবং সেখানে আনীত সাতারা-রাজাদের কাগজপত্র হইতে শিবাজী বা তাঁহার দুই পুত্রের সময়কার কোন ঐতিহাসিক দলিল পাওয়া যায় নাই; দু'চারিটা হুকুম বা স্থানীয় বিচারের রায় (মহজর-নামা) মাত্র মিলিয়াছে। সুতরাং ঐ দপ্তর পরীক্ষা আরম্ভ করিবার সময় যে একটি বড় আশা সকলের মনে জাগিয়াছিল, তাহা বিফল হইয়াছে। কিন্তু এই সব কাগজ হইতে পেশোয়া-যুগের অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত, মারাঠা ইতিহাস পূর্ণ ও নবীন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে।

প্রথম পেশোয়া বালাজী বিখনাথ ভট্ট এতদিন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ছায়ার মত অস্পষ্ট ছিলেন; তাঁহার কার্যকলাপ, ক্রমোন্নতি এবং রাজার মনের উপর প্রভাব-বিস্তারের কাহিনী আমাদের ভাল জানা ছিল না। এসব কথা আমরা পেশোয়াদপ্তরের কাগজ হইতে সত্তা জানিতে পারিয়াছি। আরও জানিয়াছি যে, বালাজী প্রথমে নগণ্য লোক ছিলেন না, তাঁহার অভ্যুদয় যে সালে আরম্ভ হয় বলিয়া এতদিন লোকের বিশ্বাস ছিল, তাহার অনেক বৎসর আগেই তিনি স্বদেশের রাজকার্যে উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন—সেনাকর্তা, জেলাশাসক প্রভৃতির কর্ম করিতেছিলেন। ক্রমে আরও বড় হইয়া, অবশেষে প্রধান মন্ত্রী মুখ্যপ্রধান-এর পদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার প্রতি অগ্র মন্ত্রীদের বা সদারগণের ঈর্ষ্যা ও বাধা দিবার চেষ্টা এই নূতন কাগজ হইতে বেশ পরিষ্কার ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তাহার পর, দ্বিতীয় পেশোয়া বাজী রাও-এর উত্তর-ভারতে অভিযান, মালব-বিজয়, দিল্লীর দ্বার পর্যন্ত লুঠ, ভূপালের নিকট নিজামকে পরাজয় প্রভৃতি ঘটনাগুলি, যাহা

এতদিন সংক্ষেপে জানা ছিল তাহার সম্বন্ধে অতিবিস্তৃত, দিনের পর দিন তারিখযুক্ত কাহিনী এই দপ্তর হইতে উদ্ধার হইয়াছে ও তাহার সাহায্যে এতদিনকার প্রচলিত ভুল কথা ও মিথ্যা তারিখ এখন সংশোধন করা যায়।

এই ৪৫ ভলুম মারাঠী উপকরণ বিশেষভাবে পড়িয়া বুঝিয়াছি যে, এই পেশোয়ারদের দপ্তর মারাঠা ইতিহাসের উপর যেমন নূতন আলোক পাত করে, দিল্লী সাম্রাজ্যের এবং নিজামের ইতিহাসের জন্তও তাহা অপেক্ষা কম মূল্যবান নূতন সংবাদ দেয় না। ফলতঃ হায়দরাবাদের নিজামদের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাধিক পরিমাণের আদিম ঐতিহাসিক উপকরণ এই মারাঠা ভাষায় লিখিত কাগজগুলিতে আছে—এত ফারসী ভাষায়ও নাই, নিজামের দপ্তরখানাতেও নাই। ১৭২৭ হইতে ১৭৬২ পর্যন্ত বারম্বার নিজাম-পেশোয়া সংঘর্ষ, যুদ্ধ ও সন্ধির, অতি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ এই মারাঠা কাগজ হইতেই রচনা করা সম্ভব।

সেই মত মাদ্রাজ কর্ণাটকে মারাঠাদের অভিযান,—যাহাতে ক্লাইভের অভ্যুদয় হইল, এবং যাহার এক তরফা অর্থাৎ ইংরাজপক্ষের উজ্জী-মাত্র আমরা এতদিন জানিতাম,— তাহার সম্বন্ধে মারাঠা পক্ষের সাক্ষ্য এবং নূতন তথ্য এই দপ্তরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারতের পশ্চিম প্রান্তে পোতুগীজ-পেশোয়া সংঘর্ষগুলিরও সেই মত মৌলিক বিস্তৃত মারাঠা চিঠিপত্র পাইয়া আজ আমরা এতদিন পর্যন্ত জ্ঞাত পোতুগীজ ভাষায় লেখা ইতিহাসের ফাঁকগুলি পূরাইতে, ভুলগুলি সংশোধন করিতে পারিতেছি।

মারাঠা ইতিহাসে সবচেয়ে বেশী চিত্তাকর্ষক বিষয় হইতেছে ১৭৬১ সালের জাহ্নগিরি মাসে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ এবং তাহার পূর্ববর্তী উত্তর ভারতীয় অভিযানগুলি। মারাঠা ভাষার কাগজপত্রে ঐ যুদ্ধ সম্বন্ধে অতি মৎসামান্য নূতন খবর অধুনা পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু ১৭৫৪ হইতে ১৭৬০ সালের শেষ পর্যন্ত, অর্থাৎ ঐ মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত, মারাঠা সৈন্যদের গতিবিধি, নেতাদের মন্ত্রণা ও নীতি পরিবর্তন, অপরাপর শক্তিগুলির সহিত সন্ধি বিগ্রহ, দেশের দশা প্রভৃতি বিষয়ে অতি বিস্ময়জনক বিপুল নূতন খবর,—সবই সমসাময়িক ও লিখিত—আজ আমাদের হাতে আসিয়াছে। এই কাজ আরম্ভ করেন বিশ্বনাথ কাশীনাথ রাজবাড়ে, কয়েকটি মারাঠা ঐতিহাসিক পরিবারের দপ্তর মধ্যে আবিষ্কৃত কাগজপত্র ১৮২৮ সালে প্রথমথণ্ডে এবং ১৯০৭ সালে ষষ্ঠথণ্ডে ছাপিয়া। গৌবিন্দ সখারাম সরদেশাই নিজের সম্পাদিত “পেশোয়ার দপ্তর হইতে বাছা কাগজপত্র” ৪৫ ভলুমে এই কাজ সম্পূর্ণ বিস্তৃত এবং সরকারী দলিলের স্বদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন। বিশেষতঃ বাঙ্গলায় বর্গীর হাঙ্গামার পশ্চাতে মারাঠারাজদরবারের নীতি এবং এই সব অভিযানের ইতিহাস শুধু এই কাগজ হইতেই নূতন করিয়া লেখা সম্ভব।

তারাবাই ও আনন্দীবাই, অর্থাৎ ছত্রপতি রাজারাম এবং পেশোয়া রঘুনাথরাও দাদা, এই দুজনের স্ত্রী—অতি তুখোড় ফন্দিবাজ জঙ্গী নারী ছিলেন। তাঁহাদের অনেক বর্ষব্যাপী চিঠিপত্র আবিষ্কার হওয়ায় তাঁহাদের চরিত্র এবং সেই সেই যুগে রাজনৈতিক ঘটনার ভিতরে কিরূপে কল চলিত, তাহার প্রকৃত তত্ত্ব এখন জানা যায়। সরদেশাই সম্পাদিত আরও

কয়েকটি ভলুমে পেশোয়াদের পারিবারিক জীবনের এবং সেকালকার সমাজের অতি উজ্জ্বল চিত্র পাইতেছি; ইহাও নূতন। সর্বশেষে, অনেকগুলি বিখ্যাত মারাঠা সরদার-বংশের প্রতিষ্ঠাতাদের বা প্রথম ২১৩ পুরুষের আত্মজীবন-বিবরণ এই দপ্তর হইতে সংকলন করিয়া প্রচলিত প্রবাদগুলি খণ্ডন করা গিয়াছে।

সুতরাং সকলে দেখিবেন যে, এই নূতন আবিষ্কৃত উপকরণগুলি কত মূল্যবান, কত বিচিত্র, কত মনোরম। অতীত কোন প্রদেশের ইতিহাসের ক্ষেত্রে বর্তমান কালে এমন সৌভাগ্যজনক আবিষ্কার ঘটে নাই, ঘটবার আশাও নাই।

এই ত গেল মারাঠা ইতিহাসের নূতন মালমসলা। এখন শিবাজীর পর মারাঠা রাষ্ট্রের ঘটনাস্রোত পর্যবেক্ষণ করা যাউক। আমি ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণ দিয়া বা স্থলপাঠ্য পুস্তকের মত ইতিহাসের রকম এখানে খাড়া করিয়া, আপনাদের বিরক্ত করিব না। আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিব, এই শিবাজীর পরবর্তী ১৩৭ বৎসর ধরিয়া স্বাধীন মারাঠা রাজ্যে ও রাজনীতিতে কি কি বড় পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, কোন্ কোন্ প্রভাবে ঘটনাগুলি সেই আকার ধারণ করিল, এবং জননেতাদের কি কি দোষগুণে মারাঠাদের রাষ্ট্রীয় উন্নতি বা পতন হইল।

শিবাজীর মৃত্যুর বিশ বৎসরের মধ্যেই তাঁহার রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়া গেল; দাক্ষিণাত্যে মুঘল বাদশাহ নামে চক্রবর্তী সম্রাট হইলেন। মারাঠা রাজ্যের উত্তরাধিকারী হয় বন্দী, না হয় পলাতক ক্ষুদ্র জমিদারের মত কাল কাটাইতে লাগিলেন। শিবাজীর দুই পুত্র, শম্ভুজী ও রাজারাম, ক্রমান্বয়ে সিংহাসনে বসিয়া রাজ্য চলাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু রাজারামের মৃত্যুর পর (১৭০০ খৃষ্টাব্দ হইতে) মারাঠা ইতিহাসের শিব-পশ্চাৎ যুগের প্রথম অংশ, অর্থাৎ রাজাদের কাল, শেষ হইল, এবং সাত বৎসর ধরিয়া (১৭০০-১৭০৭, আওরংজীবের মৃত্যু পর্যন্ত) অরাজকতায় কাটিল। কারণ, শম্ভুজীর পুত্র শাহ তখন মুঘল শিবিরে বন্দী, কোলাপুরে তারাবাই নিজ পুত্রকে রাজা বলিতেন, কিন্তু বেশী লোক তাহাকে স্বীকার করিত না; কেন্দ্রীয় রাজশক্তি দেশ হইতে নির্বাসিত, এই হইল সেই দেশের দশা। সত্য বটে, আওরংজীবের মৃত্যুর চারি মাস পরে শাহ খালাস পাইয়া নিজ দেশে ফিরিলেন এবং পিতা-পিতামহের রাজ্য দখল করিতে চাহিলেন, কিন্তু তাহার পর পাঁচ ছয় বৎসর ধরিয়া তাঁহাকে ক্রমাগত অব্যর্থ সামন্তগণ এবং ভাগী অংশীদার (পিতৃব্যপুত্র, কোলাপুরের রাজা)-র সহিত যুদ্ধ করিতে হইল।

অবশেষে ১৭১৩ সালে শাহ রাজা হইয়া বসিলেন (সাতারার ছত্রপতি বংশ)। কিন্তু এখন হইতে পেশোয়াদের যুগ আরম্ভ হইল; কারণ, তাঁহার সিংহাসনের শুভ হইলেন তাঁহার প্রধান মন্ত্রী বা পেশোয়া। ছত্রপতি শাহ এই বিশ্বাসী এবং কার্যদক্ষ মন্ত্রীর হাতে সব শাসন কাজ ছাড়িয়া দিয়া, নিজে শুধু উপরে উপরে তত্ত্বাবধান এবং প্রদানদের মধ্যে ঝগড়া মিটান লইয়া ব্যস্ত থাকিলেন।

মারাঠা ইতিহাসে পেশোয়া-যুগ অতি পরিষ্কার ছই ভাগে বিভক্ত; এই বিভাগের রেখা ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমপথের শেষ যুদ্ধ এবং তাহার অব্যবহিত পরে পেশোয়া বালাজী

বাজী রাওএর মৃত্যু এবং তাঁহার নাবালক পুত্র মাধব রাওএর সিংহাসন-প্রাপ্তি। এই দুটি কাল-বিভাগের মধ্যে ঘটনাস্রোতে, নেতা-চরিত্রে এবং রাষ্ট্রনীতিতে বেশ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

একটা প্রচলিত বিশ্বাস আছে যে, এই সব পেশোয়ারা স্বার্থপর প্রভুদ্রোহী চাকর ছিল। কিন্তু এটা ভয়ানক ভুল। কারণ, বন্ধুবান্ধবহীন নবাগত শাহুকে সিংহাসনে স্থিরভাবে বসাইলেন, এবং এইরূপে নবজীবনপ্রাপ্ত মারাঠা রাজশক্তিকে স্থায়ী এবং ভারতব্যাপী করিলেন পেশোয়ারা; এ কাজ শাহু করিতে পারিতেন না; আর পেশোয়ারা না উঠিলে মারাঠাজাতি কখনই গুজরাত মালব কর্ণাটক জয়, এবং দিল্লী পঞ্জাব বাদ্খালা পর্যন্ত লুট করিতে পারিত না। কোলাপুরের রাজবংশের মত আর একটি স্থানীয় জমিদার সাতারায় স্থাপিত হইত মাত্র, এবং তাঁহার পক্ষে ছত্রপতি উপাধি হাসির বিষয় হইত।

প্রথম পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথ ভট্ট কোন্ কোন্ বাধা ঠেলিয়া ফেলিয়া নিজ প্রভুকে দেশের রাজা বলিয়া সকলের দ্বারা গৃহীত করিতে এবং স্থায়ীভাবে সিংহাসনে বসাইতে আর কোলাপুরের রাজশাখাকে নীচে ঠেলিয়া দিতে পারিয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে তাঁহার চরিত্রের গুণগুলি কত বিচিত্র এবং সাতারার রাজবংশের তিনি যে কত বেশী উপকারক ছিলেন, তাহা বুঝা যায়। ১৭০৭-১৭১২ সালে ঐ দেশ অরাজকতায় পূর্ণ, প্রত্যেক লোকই স্ব স্ব প্রধান, কেহ কোন রাজাকে মানিতে বা কর দিতে অথবা স্বদেশের কাজে অস্ত্রের সহিত মিলিতে সম্মত নহে। মুঘল-কারাগার হইতে প্রত্যাগত শাহুর না ছিল অর্থ, না ছিল লোকবল। তাহার উপর, তারাবাইএর নানাপ্রকার চক্রান্ত ও আক্রমণ-চেষ্টা। রাজার জমি সব নানা সামন্ত, পূর্বকর্মচারীদের পুত্রগণ, অথবা জবরদস্ত স্বার্থপর নূতন লোকে দখল করিয়া বসিয়াছে।

ইহা ভিন্ন, শাহুর পক্ষের অগ্রাণু কর্মচারিগণ, বিশেষতঃ অষ্ট প্রধানদের অপর সাত জন, পেশোয়ার প্রতিদ্বন্দী, তাঁহার প্রাধান্য মানিতে অসম্মত, সব কাজে তাঁহাকে অপদস্থ ও নিষ্ফল করিতে ব্যগ্র। মারাঠা রাজ্যের সেনাপতি-উপাধিদারী “প্রধান” মারাঠা জাতের, তিনি ব্রাহ্মণ পেশোয়ার উপর হাড়ে হাড়ে চটা, এবং তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে পর্যন্ত অগ্রসর। এইরূপ রাজসভায় বালাজী বিশ্বনাথ যে নিজ প্রাধান্য স্থাপন করিলেন, ইহাই তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। তাঁহারই চেষ্টায় দিল্লীর বাদশাহ ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে সনদ দিয়া শাহুকে শিবাজীর স্থায়া উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করেন এবং তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যের চৌধ ও সব-দেশ-মুখীর অধিকার দান করেন। শাহুর অধীনে প্রথম প্রথম কোন বড় সেনাপতি ছিল না। বালাজীর পুত্র বাজী রাও (১৭২০-১৭৪০ পর্যন্ত পেশোয়া) এই অভাব পূর্ণ করিলেন। বাজী রাওএর অদ্ভুত সামরিক দক্ষতা এবং আজন্ম নেতৃত্বশক্তির ফলে মারাঠাদের রাজ্য এই ত্রিশ চল্লিশ বৎসরের মধ্যে প্রকৃতই ছত্রপতি হইলেন, মুঘল সাম্রাজ্য অন্ধকার করিয়া নানা প্রদেশে নিজ প্রভুত্ব বিস্তার করিলেন; আটক হইতে কুমারিকা পর্যন্ত লোকে মারাঠা নামে কাঁপিতে লাগিল। এরূপ কার্য শিবাজীও করিতে পারেন নাই। ইহাই পেশোয়াদের শ্রুতিস্তুত।

বাজী রাও ঘরের পাশে নিজামের সঙ্গে প্রথমে যুদ্ধ ও পরে সন্ধি করিয়া, অদম্য তেজে উত্তর-ভারত ও পোৰ্তুগীজ রাজ্য আক্রমণ করিলেন; রাজপুতানায় কর আদায়, মালব অধিকার, গুজরাত লুণ্ঠন (এবং তাঁহার পুত্রের সময় সম্পূর্ণ দখল) এবং বৃন্দেলখণ্ডে ভাগ বন্টন প্রভৃতি তাঁহার সফলতার চিহ্ন। মারাঠাদের এই রাষ্ট্রীয় বিস্তার তৃতীয় পেশোয়া বালাজী বাজী রাওএর সময়ে (১৭৪০-১৭৬১) চরমে পৌঁছে, এবং সেই সময়ই তাহার অবনতি আরম্ভ হয়। প্রথমতঃ রাষ্ট্রের প্রধান নেতা শুধু যুদ্ধবিগ্রহে সর্বদা মন দেওয়ায় শাসন কার্যে অবহেলা হইতে লাগিল; প্রজাদের অবস্থা বড় খারাপ হইয়া দাঁড়াইল; অবিচার, ঘুষ লওয়া, জনহিতকর কার্যে অবজ্ঞা, দেশের দৈন্য দিন দিন বাড়িতে লাগিল। পেশোয়াদের দেনা এত বেশী হইয়া উঠিল যে, উত্তর-ভারত লুণ্ঠ করা ভিন্ন তাহা শোধ দিবার কোন পথ দেখা গেল না; অথচ উত্তর-ভারতে বৃহৎ অভিযান পাঠাইলে তাহার খরচেই সব আদায় করা কর এবং লুণ্ঠ করা ধন খাইয়া ফেলিত। এইরূপে যখন বাহ্যত মারাঠা শক্তি মধ্যাহ্ন-সূর্যের মত সকলের মাথার উপর তাপ দিতেছিল, তখনই মারাঠা স্বরাজ প্রকৃতপক্ষে অন্তঃসারশূন্য হইয়া জাতীয় ক্ষয়রোগের মৃত্যুবীজ নিজ দেহে পোষণ করিতে লাগিল। পানিপথে পরাজয় এবং সেখানে যত বড় মারাঠা সরদার এবং অর্ধেকসিঁহী সৈন্তের মৃত্যু ইহার একটি দৃষ্টান্ত মাত্র।

তদপেক্ষা অধিকতর ভীষণ ধ্বংসের কারণ হইল পেশোয়া রাজবংশে এবং কর্মচারি-মণ্ডলে নৈতিক অবনতি এবং অন্তঃকলহ। তরুণ পেশোয়া মাধব রাও বাল্লালের পিতৃব্য রঘুনাথ রাও জঘন্য স্বার্থসিদ্ধির জন্ত দেশের সর্বপ্রকার অনিষ্টই করিলেন, জাতীয় সকল শত্রু (নিজাম, ইংরাজ প্রভৃতির) সহিত বারম্বার যোগ দিলেন। মাধব রাওএর অকালমৃত্যু (১৭৭২) এবং নারায়ণ রাওএর খুন (১৭৭৩) এত কাছাকাছি ঘটয়া মারাঠা-রাজকে একেবারে বজাহত করিল। সেই স্থযোগে ইংরাজেরা যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ব্যক্তি অপেক্ষা জাতি বা জনসমষ্টি অনেক শ্রেষ্ঠ; মারাঠাদের মধ্যে এই সজ্ঞপ্রাণ, জাতীয় শক্তি এত অধিক ছিল যে, “বারা ভাই” জুটিয়া এই মহাবিপদের মধ্য হইতে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে বাঁচাইলেন; কুলাঙ্গার রঘুনাথকে পরাজিত করিয়া মাধব রাও নারায়ণের সিংহাসন বজায় রাখিলেন। এই আভ্যন্তরীণ যুদ্ধের সময় নানা ফড়নবিস্ দেশের শাসনক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ পদ নিজগুণে অধিকার করিলেন, অর্থাৎ নাবালক পেশোয়ার রক্ষাকর্তা এবং পরে “পেশোয়ার পেশোয়া” হইয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু তাঁহার রক্ষণ অপেক্ষা গঠনের শক্তি অনেক কম ছিল, ভবিষ্যদৃষ্টি একেবারেই ছিল না; নানা মতের, নানা শ্রেণীর লোকদের মিলাইয়া মিশাইয়া আপোষে সমবেত চেষ্টায় দেশের জন্ত বড় বড় কাজ করিবার যে আশ্চর্য শক্তি ইংরাজ জাতির আছে, নানা ফড়নবিসের চরিত্রে তাহার সম্পূর্ণ অভাব ছিল, তাঁহার কল্পনারও অতীত ছিল। তিনি সব কাজ নিজে করিতে চাহিতেন, সর্বত্রই স্বয়ং প্রভু, একমেবাদ্বিতীয়ং হইতে চেষ্টা করিতেন।

এদিকে, এই শেষ যুগে মারাঠা শক্তির প্রকৃত কেন্দ্র পূণা হইতে উত্তর-ভারতে সরিয়া আসিল, সিদ্ধিয়া মালব, দিল্লী এবং রাজপুতানায় প্রভু হইয়া দাঁড়াইলেন, অথচ নানা ফড়নবিস্ তাঁহার সহায়তা না করিয়া হিংসায় বাধা দিতে লাগিলেন। অপর প্রান্তে টাণ্ডু স্বলতান!

অতি প্রবল হইয়া উঠায়, পূণার মারাঠারাজ ভীত, অনেকটা হতবীর্য হইয়া ইংরাজদের সাহায্য ভিক্ষা করিতে লাগিলেন; অথচ কর্ণওয়ালিসের সময়ে অকপটভাবে ইংরাজের সহায়তা করিয়া টীপুকে নাশ করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন। অতি-চালাক লোক নিজ চালাকির ফাদে পড়িয়া অবশেষে নিজেই মারা যায়। নানা ফড়্‌নবিসের বিফলতা এই সত্যই প্রমাণ করিতেছে।

তাঁহার মন্ত্রিত্বের শেষে পেশোয়ার অপঘাত মৃত্যু (কেহ বলে আত্মহত্যা), নচ্ছার রঘুনাথের ততোধিক অসার পুত্র দ্বিতীয় বাজী রাওএর সিংহাসন প্রাপ্তি, সিদ্ধিয়া-হোলকারের মধ্যে গৃহযুদ্ধ, এবং অবশেষে ইংরাজের দাসত্ব (১৮০২) এবং ইংরাজ কর্তৃক পেশোয়ারাজ্য জয় করা (১৮১৮) এ সব ঘটনা সকলেরই জানা ইতিহাস। এই সর্বশেষের ১৫ বৎসর (১৮০৩-১৮১৭) ধরিয়া মারাঠা ইতিহাস, পেশোয়ার পক্ষে তীব্র বিষম এবং আমাদের পক্ষে অসীম লজ্জার ও শোকের বিষয়।

শ্রীযত্ননাথ সরকার

বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস

খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি

সম্প্রতি এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে অত্র একটি বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমি শতাধিক বর্ষ পূর্বে প্রকাশিত একখানি মাসিক পত্রের সন্ধান পাইয়াছি। ইহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা সম্ভব মনে করি, কারণ এ-যাবৎ যাহারা বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের কেহই এই মাসিক পত্রের অস্তিত্বের কথা অবগত ছিলেন না; এমন কি অল্পদিন পূর্বে যখন আমি ‘দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস’, প্রথম খণ্ড (১৮১৮-১৮৩৯ সন পর্যন্ত), প্রকাশ করি তখনও আলোচ্য পত্রিকাখানির কথা আমার নিকট অজ্ঞাত ছিল।

পত্রিকাখানির নাম “খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি”। ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮২২ সনের মে মাসে। এই “মাসিক সমাচার পত্র” শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হইত; প্রত্যেক সংখ্যার শেষে লেখা থাকিত :—

“এই সমাচারপত্র প্রতিমাসে শ্রীরামপুরের ছাপাখানাহইতে প্রকাশিত হইবে ইহার মূল্য প্রতি কাগজ এক আনা লাগিবেক।”

খ্রীষ্টধর্মপ্রচারের সহায়তাকল্পে পত্রিকাখানির সৃষ্টি হয়। প্রথম সংখ্যার প্রারম্ভেই নিম্নাংশ মুদ্রিত হইয়াছে :—

“সকলকে জানান যাইতেছে এই পত্র প্রতিমাসে শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপা করিবার বাসনা আছে অতএব যে কোন খ্রীষ্টিয়ান মণ্ডলীর কোন সমাচার প্রকাশের আবশ্যকতা বোধেন তাহা এখানে পাঠাইলে এই পত্রে ছাপান যাইবেক।”

ইহার পর খ্রীষ্টিয়ানদের উদ্দেশ্য করিয়া লেখা একটি দীর্ঘ প্রস্তাব মুদ্রিত হইয়াছে। এই প্রস্তাবের নিম্নোক্ত অংশ হইতে পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য স্পষ্ট জানা যাইবে :—

“অত্র দেশে খ্রীষ্টিয়ান লোকেরা কিরূপ পাণ্ডিত্যের পরিব্রাণার্থে প্রার্থনা করে ও মঙ্গল সমাচার ঘোষণা করিতে ও লোকেরদিগকে শিক্ষা করিতে কিরূপ পরিশ্রম করে ও অত্র লোকদ্বারা মঙ্গল সমাচার ঘোষণা করিতে আপনারা কত টাকা ব্যয় করে ও ইহর তাহারদিগের প্রার্থনা কিরূপ শ্রবণ করেন ও তাহারদের ক্রিয়ার ফল দেন। এই সকল তোমারদিগকে জ্ঞাত করার কারণ মাসে এই মত পুস্তক ছাপা হইবে। তাহাতে নানাদেশীয় ভাল সমাচার দেওয়া যাইবেক এই পুস্তক বিষয়েতে যে লাভ হইবে তাহা ভালমত পুস্তক ছাপাইয়া ধর্মজ্ঞানার্থে হিন্দুরদিগকে দিতে এবং তাহারদিগকে পরিত্রাণের পথ শিক্ষা করাইতে ব্যয় করা যাইবেক। আমরা এই ভরোসা করি যে তোমরা এ বিষয়ে আমারদিগের সহায়তা করিবা ও মাসে কিছু করিয়া দিবা ও প্রভু যিশু খ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচার ঘোষণা করণার্থে বাঙ্গালি খ্রীষ্টিয়ানের মধ্যে এক দল কর। যখন খ্রীষ্ট মেসুর ম্যাক সাহেব ইহা ছাড়িলেন তখন কতক গরিব চাকরেরা একত্র হইয়া বাঙ্গালি কোন কেতাব ছাপাইয়া বাঙ্গালি লোককে দিতে ৫ টাকা দিল তাহার বাঙ্গালি লোকেরদিগকে প্রেম বোধ করিয়া টাকা দিল এই পাঁচ টাকার দ্বারা আমরা এক পুস্তক আরম্ভ করিব এবং এই ভরোসা করি যে তোমরা ক্রমেই ইহা বৃদ্ধি করিবা।” (পৃ. ৫-৬)

“খ্রীষ্টের রাজ্যবুদ্ধি” পত্রিকাখানির প্রত্যেক সংখ্যায় ৮ পৃষ্ঠা পরিমাণ খ্রীষ্টধর্মের কথা থাকিত। খ্রীষ্টীয় তত্ত্ব বিষয়ে ইহা দ্বিতীয় মাসিক পত্র; এ-বিষয়ে সর্বপ্রথম মাসিক পত্র ‘গস্‌পেল মাগাজীন’ ১৮১২ সনের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়।

‘খ্রীষ্টের রাজ্যবুদ্ধি’ পত্রিকার ফাইল।—

এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা :—১ খণ্ড। ১ সংখ্যা। মে, ১৮২২।

১ খণ্ড। ১০ সংখ্যা। স্ক্রেয়ারি, ১৮২৩।

১ খণ্ড। ১৪ সংখ্যা। জুন, ১৮২৩।

২ খণ্ড। ১ সংখ্যা। জানুয়ারি, ১৮২৪।

‘বঙ্গদূত’ প্রকাশের তারিখ

‘বঙ্গদূত’ নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র ১৮২২ সনের ২ই মে, শনিবার, তারিখে প্রথম প্রকাশিত হয়। এত দিন ইহার প্রথম সংখ্যার তারিখ ভ্রমক্রমে “১ই মে, রবিবার” বলিয়া চলিয়া আসিয়াছে।

ইংরেজী, বাংলা, ফার্সী ও নাগরী—এই চারি ভাষায় ‘বেঙ্গল হেরাল্ড’ নামে একটি সাপ্তাহিক পত্র প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় প্রকাশ করিবার জন্য ৭ নং বাঁশতলা গলির সার্জন আর. মণ্টগোমারি মার্টিনকে ১৮২২ সনের ৫ই মে তারিখে সরকার লাইসেন্স মঞ্জুর করেন। ‘বেঙ্গল হেরাল্ড’ কেবল ইংরেজীতেই প্রকাশিত হইত; ইহার “সহচর” ছিল ‘বঙ্গদূত’। ‘বঙ্গদূত’ের প্রথম সংখ্যার তারিখ ২ই মে ১৮২২ (শনিবার)। ‘বেঙ্গল হেরাল্ড’ পত্রের প্রথম সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় উহার অস্থগান-পত্র মুদ্রিত হইয়াছে; তাহাতে ‘বঙ্গদূত’ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত অংশ পাওয়া যায় :—

Prospectus of the *Bengal Herald*

A Native paper to be printed in the Bengalee, Persian and Nagree character, will be subjoined, but distinct, and under the Superintendence of the most talented Hindoos; translations from whose contributions will be occasionally made.

The English portion of the *Herald* will contain *Sixteen Pages*, royal quarto, and the *Native Eight*, which will admit of separate subscription, the former at the rate of *Two* rupees and the latter *One*, monthly.

To be Printed and Published every Saturday night, for the Proprietors,

R. M. Martin,
Dwarkanath Tagore,
Prussuna Comar Tagore,

Rammohun Roy,
Neel Rutton Holdar, and
Rajkissen Sing.

জানা গেল, ‘বঙ্গদূত’ প্রতি শনিবার রাতে প্রকাশিত হইত। ইহার প্রথম সংখ্যা যে ১৮২২ সনের ২ই মে, শনিবার, তারিখে প্রকাশিত হয় তাহার আর একটি প্রমাণ, তৃতীয় সংখ্যার তারিখ ১৮২২, ২৩এ মে, শনিবার। এই সংখ্যাখানি কলিকাতার ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরিতে আছে।

শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বড় চণ্ডীদাসের পদ

উক্তর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে চণ্ডীদাসের পদাবলীর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। পদগুলির পাঠান্তর দেওয়ায় বিশেষজ্ঞদিগের নিকট পুস্তকখানি সমাদৃত হইবে। গ্রন্থের ভূমিকায় বলা হইয়াছে,—“আমরা এ পর্য্যন্ত দুই জন চণ্ডীদাসের পরিচয় পাইয়াছি। একজন শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী বড় চণ্ডীদাস, অল্প জন শ্রীচৈতন্য-পরবর্তী দীন চণ্ডীদাস। একটু অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিলেই এই দুই জন কবির পদ পৃথক্ করা যায়। কিন্তু বড় ও দীন চণ্ডীদাস ভিন্ন, ‘চণ্ডীদাস’ এই নামের অন্তরালে যে অল্প কবিদের পদ চলিতেছে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে সেগুলিকে চিনিয়া লওয়া একরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার। ভাব ও রূপের পরিবর্তনে বিরূত হইয়া পড়িয়াছে, এমন পদেরও অভাব নাই। এই সমস্ত আলোচনাপূর্বক আমরা বড় চণ্ডীদাসের পদ যথাসম্ভব পৃথক্‌রূপে চিহ্নিত করিয়াছি। ভণিতা নাই, অথচ বড় চণ্ডীদাসের রচিত হওয়া সম্ভব, এইরূপ কয়েকটি পদ বা পদাংশ ইহারই পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যে সমস্ত পদের রচয়িতার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই, যেগুলি বড় চণ্ডীদাস অথবা দীন চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া গ্রহণ করা চলে না, সেগুলি ‘চণ্ডীদাস-নামাস্কৃত’ পর্যায়ে রক্ষা করিয়াছি, এবং তাহার পরিশিষ্টরূপে বিভিন্ন কবির ভণিতাযুক্ত পদগুলি সাজাইয়া দিয়াছি।” এই খণ্ডেই দীন চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত শ্রীকৃষ্ণজয়লীলার কয়েকটি অপ্রকাশিতপূর্ব পদ প্রকাশিত হইয়াছে।

চৈতন্যদেব যাহার পদাবলীর আশ্বাদনে মাতোয়ারা হইতেন, তিনি বড় চণ্ডীদাস। বড় চণ্ডীদাস বাঙ্গালার কাব্যকুঞ্জের আদি-পিক। তাহার রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বলিয়া কথিত শ্রীকৃষ্ণলীলার গানের খণ্ডিত পুথিখানি আমরা পাইয়াছি। তাহার অতিরিক্ত পদগুলির সন্ধানে সম্পাদকদ্বয় বিপুল পরিশ্রমে পদাবলী-সাহিত্য মথিত করিয়া মাত্র ২৪টি পদ উদ্ধার করিয়াছেন। ইহার মধ্যে “দেখিলে” প্রথম “নিশী” পদটি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও পাওয়া যায়। সম্পাদকদ্বয় বড় চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে তাহার রচিত পদাবলীর পরীক্ষায় কষ্টিপাথররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। আমিও এই কষ্টিপাথরের পরখে তাহাদের উদ্ধৃত বড়-চণ্ডীদাসের পদগুলি টিকিতে পারে কি না, দেখিব। দুঃখের বিষয়, বিজ্ঞ যুগ-সম্পাদক প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় বড় চণ্ডীদাসের পদপরিচয়ের সূত্রগুলি আমাদিগকে বলেন নাই। কাজেই আমি নিজের গবেষণায় বড় চণ্ডীদাসের পদের বিশেষ লক্ষণ বাহা আবিষ্কার করিয়াছি, প্রথমে তাহাই বলিব।

সর্বপ্রথম ও প্রধান লক্ষণ ভণিতা। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে খণ্ডিত পদ-সমেত পদসংখ্যা ৪১৫টি। ইহার ৪০৯টি ভণিতাকে সংখ্যার অবরোহক্রমে সাজাইলে এইরূপ দাঁড়াইবে—

১। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে—পদের সর্বশেষে সাধারণতঃ দশ অক্ষর ছন্দ ও ত্রিপদীতে	...	৭৫
২। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ—পদের সর্বশেষে পয়ায়ে	...	৫৭
৩। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে—পদের সর্বশেষে পয়ায়ে	...	৪৯
৪। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে—পদের সর্বশেষে পয়ায়ে	...	৪৯
৫। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস—পদের সর্বশেষে পয়ায়ে	...	২৯
৬। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর—পদের সর্বশেষে পয়ায়ে	...	২৭
৭। বাসলীচরণ শিরে বন্দিয়া গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে—পদের সর্বশেষে ত্রিপদীতে	...	২৪
৮। বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ—পদের সর্বশেষে পয়ায়ে	...	১১
৯। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বরে—পদের সর্বশেষে পয়ায়ে	...	১০
১০। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগতী—পদের সর্বশেষে পয়ায়ে	...	৭
১১। —গাইল চণ্ডীদাসে—পদের সর্বশেষে চরণে পয়ায়ের শেষাংশে	...	৪
১২। বড়ু চণ্ডীদাস গাএ—পদের সর্বশেষে	...	৩
১৩। বাসলীচরণ শিরে বন্দিয়া বড়ু চণ্ডীদাস গাএ—লঘু ত্রিপদীর শেষে	...	৩
১৪। গাইল চণ্ডীদাস বাসলীবরে—সর্বশেষে	...	৩
১৫। বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাস—পদের সর্বশেষে একাবলীতে	...	২
১৬। বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে—পদের সর্বশেষে	...	২
১৭। —গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বন্দিয়া বাসলীচরণে—পদের সর্বশেষে ত্রিপদীতে	...	২
১৮। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী আই (আয়ী)—পদের সর্বশেষে	...	২
১৯। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস—পদের সর্বশেষে	...	২
২০। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বন্দিয়া বাসলী—পদের সর্বশেষে	...	২
২১। বাসলী বন্দিয়া গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে—পদের সর্বশেষে	...	২
২২। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস শিরে বন্দিয়া দেবী বাসলীচরণে—পদের সর্বশেষে	...	২
২৩। —গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে বন্দিয়া বাসলী চরণে—পদের সর্বশেষে	...	২
২৪। বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে—পদের সর্বশেষে	...	২
২৫। বাসলীচরণ শিরে বন্দিয়া ল গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে—সর্বশেষে	...	২

ইহার পর ৩৬টা ভণিতা কেবলমাত্র এক একবার পদের সর্বশেষে ব্যবহৃত হইয়াছে।

২৬। অনন্ত নাম বড়ু চণ্ডীদাস গায়িল দেবী বাসলীগণে।
২৭। মাথাএ বন্দিয়া বাসলী গাএ। অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাএ॥
২৮। অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাইল দেবী বাসলী চরণে।
২৯। গাইল আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসে দেবী বাসলীগণে।
৩০। বাসলীচরণ শিরে বন্দিয়া আনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে।
৩১। বাসলীচরণ শিরে বন্দিয়া গাইল আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসে।
৩২। বাসলীচরণ শিরে বন্দিয়া অনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে।
৩৩। দেবী বাসলীচরণ করী শিরে বন্দন গাইল বড়ু চণ্ডীদাস।
৩৪। তুতী কৈল চণ্ডীদাস গাএ।
৩৫। —বড়ু চণ্ডীদাস গাএ বন্দিয়া বাসলীচরণে।
৩৬। বাসলী শিরে ধরি গাইল চণ্ডীদাসে।
৩৭। —বড়ু চণ্ডীদাসে গো গাইল বাসলী বরে।
৩৮। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীচরণে।

- ৩৯। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস (কাহাঞি ল) দেবী বাসলী বরে ।
 ৪০। বাসলীচরণ বন্দী গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ।
 ✓৪১। গাইল চণ্ডীদাস বাসলীগণ ।
 ✓৪২। বাসলীবরে চণ্ডীদাস গাএ ।
 ৪৩। বাসলীচরণ শিরে বন্দিঅঁ ল গাইল বড়ু চণ্ডীদাস ।
 ✓৪৪। গাইল চণ্ডীদাস বাসলীচরণে ।
 ✓৪৫। গাইল চণ্ডীদাস বাসলী আই ।
 ✓৪৬। —গাইল চণ্ডীদাস দেবী বাসলীর বরে ।
 ৪৭। বাসলীচরণ শিরে বন্দী রাধা ল বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ।
 ৪৮। গাইল বাসলী বন্দিঅঁ বড়ু চণ্ডীদাসে ।
 ৪৯। বাসলীচরণ শিরে বন্দিঅঁ ল বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ।
 ৫০। —গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে দেবী বাসলীর বরে ।
 ৫১। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস স্নন বড়ায়ি ল বাসলীগণে ।
 ৫২। —বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ল পাঅঁ দেবী বাসলীর বরে ।
 ৫৩। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস শিরে বন্দিঅঁ ল দেবী বাসলীগণ ।
 ৫৪। বন্দিঅঁ দেবী বাসলী গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ।
 ৫৫। —গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী শিরে বন্দিঅঁ ।
 ৫৬। বাসলী বন্দিঅঁ এ বড়ায়ি গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ।
 ৫৭। বাসলীচরণ শিরে বন্দিঅঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস এ ॥
 ৫৮। গাইল চণ্ডীদাস বাসলীগতী ।
 ৫৯। বাসলীচরণ শিরে বন্দিঅঁ এ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥
 ৬০। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বরে ল ।
 ৬১। বাসলী চরণ শিরে বন্দিঅঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস ॥

এই সকল ভণিতা হইতে আমরা কয়েকটি সিদ্ধান্ত করিতে পারি,—(১) বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতায় কখন দ্বিজ বা কবি বা দীন উপাধি ব্যবহার করেন নাই। (২) বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতায় “কহে”, “ভণে” ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেন নাই। তিনি “গাইল”, “গাএ” এই দুইটি ক্রিয়াপদ মাত্র ব্যবহার করিয়াছেন। (৩) তাঁহার ভণিতা পদের শেষ চরণে ব্যবহৃত; “চণ্ডীদাস গাএ স্নন গোয়ালিনী কাহাঞি করহ সার”—এইরূপ ভণিতা বড়ু চণ্ডীদাসের হইতে পারে না। (৪) কতকগুলি ভণিতা তাঁহার বিশেষ শ্রিয়। পূর্বোক্ত প্রথম ১০টি ভণিতায় ৪০৯এর মধ্যে ৩৩৮টি পদ সমাপ্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় বিশেষ লক্ষণ ভাব। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কয়েকটি বিশেষ বিষয় আছে, বাহা পরবর্তী পদাবলী-সাহিত্যে অজ্ঞাত। (ক) রাধার পিতামাতার নাম সাগর গোয়লা এবং পদ্মিনী। (খ) রাধার নামান্তর চন্দ্রাবলী। (গ) রাধার পূর্বরাগ নাই, বরং পরম বিরাগ আছে। (ঘ) রাধার কোন সখীর নাম নাই। (ঙ) কৃষ্ণের কোণ সখার নাম নাই।

তৃতীয় বিশেষ লক্ষণ ভাষা। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রেম অর্থে সর্বত্র নেহ, নেহা। এক বার মাত্র “পিরিতী” শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; কিন্তু সেখানে অর্থ প্রীতি বা সন্তোষ।

মোর বোল স্তম্ভ অবগাহী ।

কাহ্নের পিরিতী কর রাহী ।

দেহ বাণী কাহ্নের হাথে ।

ভুট্ট হউ দেব জগন্নাথে ॥ (১ম সংস্করণ, ৩২৮ পৃঃ)

বিনোদিনী, শ্রাম (কৃষ্ণ), জন্ম (যেন) প্রভৃতি শব্দগুলি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অজ্ঞাত ।

চণ্ডীদাস-পদাবলী

এক্ষণে এই বিশেষ লক্ষণগুলির সাহায্যে বড়ু চণ্ডীদাসের বলিয়া “চণ্ডীদাস-পদাবলী”তে উদ্ধৃত পদগুলির বিচার করিব ।

১ম পদ ।

ইহার ভণিতা—কহে বড়ু চণ্ডীদাসে,

কুল শীল সব ভাসে,

লাগিল কালিয়া-প্রেম-মধু ।

বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতার সহিত মিল নাই । শ্রীরাধার পূর্বরাগ বড়ু চণ্ডীদাসের ভাবের বিপরীত । “জন্ম” শব্দের প্রয়োগ পরবর্তী বিকৃতি বলিলে চলিবে না । শ্রামবর্ণ দেবা-তনু উপমা নাইক জন্ম—এখানে “জন্ম” স্থানে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের “জেন” বা “যেহ” করিলে মিল থাকে না । অধিকন্তু প্রমাণ “বড়ু”র পাঠান্তর “এই” আছে ।

২য় পদ ।

ইহার ভণিতাসহ শেষ পদ—

ডাহকি ডাকএ

কোকিল কুহরে

চকর ছাড়এ নিশ্বাস ।

বাসলীচরণ

সিরেত বন্দিয়া

কহে বড়ু চণ্ডীদাস ॥

ইহা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ৭নং ভণিতার অনুরূপ । এই পদটী বড়ু চণ্ডীদাসের ভাষায় এইরূপ হইবে—

ডাহকী ডাকএ

কোকিল কুহলে

চকোর ছাড়এ নিশ্বাসে ।

বাসলীচরণ

শিরে বন্দিয়া

গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥

এই পদটী বড়ু চণ্ডীদাসের বলিয়া গৃহীত হইতে পারে । ইহা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা-বিরহখণ্ডের অপ্রাপ্ত অংশে ছিল বলিয়া মনে হয় ।

৩য় পদ ।

ইহার আরম্ভ “দেখিলোঁ প্রথম নিশী” । ইহা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাওয়া যায় । স্মরণ্য ইহা সন্দেহ বড়ু চণ্ডীদাসের পদ । ইহাতে সম্পাদকদ্বয়, মুদ্রিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হইতে “নেহালিলোঁ” পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন । ইহা ভ্রান্ত পাঠ ; প্রকৃত পাঠ “নেহালিলোঁ” । পুথিতে “ন” ও “ল” প্রায় একরূপ বলিয়া মুদ্রিত পুস্তকের কয়েক স্থলে এইরূপ গোলযোগ হইয়াছে ।

৪র্থ পদ।

ইহার ভণিতা “বড়ু কহে বাসুলীচরণে”। বড়ু চণ্ডীদাসের কোন ভণিতায় কেবল বড়ু নাই। সুতরাং ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের পদ নহে।

৫ম পদ।

ভণিতা—“দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে গুণহ বচন।

দরশন দিয়া রাখা রাখহ জীবন ॥”

এই ভণিতা বড়ু চণ্ডীদাসের হইতে পারে না। ‘দ্বিজ’ স্থানে ‘বড়ু’ বসাইলেও বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলিয়া বুঝা যাইবে। ইহার ভাবও বড়ু চণ্ডীদাসের ভাব-বিরুদ্ধ। সেখানে শ্রীকৃষ্ণের বিরহ কেবল কামজালা, দৈহিক। এখানে বিরহ প্রেমের পূর্ণ অভিব্যক্তি, আধ্যাত্মিক। সুতরাং পদটি দ্বিজ চণ্ডীদাসের, বড়ু চণ্ডীদাসের নহে।

৬ষ্ঠ পদ।

সম্পাদকদ্বয় বলেন,—“পদটি নিঃসন্দেহভাবে বড়ু চণ্ডীদাসের”। ভাব নিঃসন্দেহ বড়ু চণ্ডীদাসের অনুরূপ। কিন্তু ইহার ভণিতা—“বড়ু কহে বাসুলীর বরে। বাগুন কি চাঁদ ধরে করে ॥”—নিঃসন্দেহ বড়ু চণ্ডীদাসের নহে। পদটি জাল। সম্পাদকদ্বয়ের ধৃত পাঠ “বাথানে কি ভেটে চন্দ্রাবলী” ভ্রান্ত। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের স্বীকৃত পাঠ “রাখালে কি ভজে চন্দ্রাবলী” প্রকৃত পাঠ।

৭ম পদ।

ভণিতা—“দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে না কহ এমন।

কার কোন দোষ নাহি সবে এক জন ॥”

ইহা কিছুতেই বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা নহে। পদটি দ্বিজ চণ্ডীদাসের।

৮ম পদ।

ভণিতা পদের শেষ চরণে—“কানু পরশিলে যাএ কহে চণ্ডীদাসে।” “কহে চণ্ডীদাসে” স্থলে “গাইল চণ্ডীদাসে” পাঠ থাকিলে পদটি বড়ু চণ্ডীদাসের হইতে পারিত; কিন্তু এরূপ পাঠ পাওয়া যায় নাই। বর্তমান প্রমাণে ইহাকে বড়ু চণ্ডীদাসের পদ বলিয়া স্বীকার করা যায় না, তবে মূলে বড়ু চণ্ডীদাসের পদ হইলেও হইতে পারে।

৯ম পদ।

ভণিতা পদের শেষ চরণে—“কহে বড়ু চণ্ডীদাস মিলিবে এথাই।” এইরূপ ভণিতা বড়ু চণ্ডীদাসের হয় না। পাঠান্তরেও দেখিতেছি, “দ্বিজ” পাঠ আছে। সুতরাং ইহা দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদ।

১০ম পদ।

ভণিতা সর্বশেষ চরণে—“কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাসুলীর বরে”। ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের “গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসুলীর বরে” ভণিতার অনুরূপ। সম্ভবতঃ মূলে এই পাঠই ছিল। এই পদটি আমরা বড়ু চণ্ডীদাসের বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

১১শ পদ।

ইহার ভণিতা—“চণ্ডীদাস কহে দৈবগতি নাহি জান।

পিরীতি-অমিয়া-রসে বধএ পরাণ ॥”

ইহা বড় চণ্ডীদাসের হইতে পারে না। ইহাতে ‘প্রেম’ অর্থে ‘পিরীতি’ শব্দের প্রয়োগও বড় চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে।

১২শ পদ।

ভণিতা ত্রিপদীর উপাস্ত্য চরণে—

বড় চণ্ডীদাসে কয় প্রেম কি অনল হয়

সুধুই যে স্খাময় লাগে।

ছাড়িলে না ছাড়ে সেহ এমতি দারুণ লেহ

সদাই হিয়ার মাঝে জাগে ॥”

এইরূপ ভণিতা কখন কালে বড় চণ্ডীদাসের হইতে পারে না। অধিকন্তু প্রমাণ এই যে, “বড় চণ্ডীদাসে কয়” ইহার পাঠান্তর “চণ্ডীদাসেতে কয়”।

১৩শ পদ।

ইহার ভণিতা পয়ারে পদের শেষ চরণে—

“সেই সে যুক্তি কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে”—ইহা দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদ।

১৪শ পদ।

ইহার আরম্ভ—“হাহা প্রাণ-প্রিয় সখি কি না হৈল মোরে”।

সম্পাদকদ্বয় বলেন,—“এই সুন্দর পদটি অবিসংবাদিতভাবে বড় চণ্ডীদাসের। কারণ, ইহার প্রথম চারিটি ছত্র শ্রীচৈতন্যদেবের সমক্ষে গীত হইয়াছিল বলিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে উল্লেখ আছে।” ৬সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় বহু পূর্বেই দেখাইয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সাক্ষ্য অকাট্য নহে। (পদকল্পতরুর ভূমিকা, পৃঃ ৯৬-১০১)। তর্কস্থলে যদিও ইহা স্বীকার করা যায় যে, চৈতন্যদেবের সমক্ষে ইহার চারি পংক্তি গীত হইয়াছিল, কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ত কোথায়ও বলেন নাই যে, ইহা চণ্ডীদাসের পদ। তাহার জন্ত একমাত্র দলিল প্রমাণ—১১১১ সালের লিখিত একটি পাতড়া, যাহাতে সমস্ত পদটি উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রথমতঃ তাহার ভণিতা পয়ারের শেষ চরণে—

“চণ্ডীদাস কহে ধনি এমতি না বল”—কখনই বড় চণ্ডীদাসের ভণিতা হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ তাহার ভাষা “হেদে রে”, “অবলা” “কাল” (= কৃষ্ণ) বড় চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে। স্তবরাং আমরা অবিসংবাদিতরূপে বলিতে পারি, পদটি বড় চণ্ডীদাসের নহে। প্রথম চারি লাইন যদি বড় চণ্ডীদাসের হয়, তাহারও কোন প্রমাণ নাই।

১৫শ পদ।

ইহার ভণিতা পয়ারের শেষ চরণে—“চণ্ডীদাস কহে তবে জুড়াইবে হিয়া।” ইহা বড় চণ্ডীদাসের ভণিতা হইতে পারে না। ভাষার দিক হইতে “আগি” (= আগুন) এবং

“পিরীতি” চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে। আগি শব্দের পরিবর্তে বড়ু চণ্ডীদাসের “আগুন” কিংবা “আগুনি” বসাইলে মিল ও ছন্দ থাকে না।

১৬শ পদ।

ইহার ভণিতা পদের শেষ চরণে পয়ারে—“বাসুলী আগেতে করি কহে চণ্ডীদাসে।”— ইহা ভ্রান্ত পাঠ। প্রকৃত পাঠ “বাসুলী আদেশে কহে কবি চণ্ডীদাসে” হইবে। নীলরতন বাবুর সংগ্রহে ইহার ভণিতা—“বাসুলী আদেশে কহে কবি দ্বিজ চণ্ডীদাসে।” যাহা হউক, ইহার কোনটাই বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা হইতে পারে না। বড়ু চণ্ডীদাস কোন ভণিতাতেই “বাসুলী আগেতে” কিংবা “বাসুলী আদেশে” ব্যবহার করেন নাই। অত্ৰ পক্ষে দীন চণ্ডীদাস কোন স্থলে বাসুলীর দোহাই দেন নাই। পদটি সম্ভবতঃ জাল কিংবা তৃতীয় চণ্ডীদাসের।

১৭শ পদ।

ইহার ভণিতা পদের শেষ চরণে পয়ারে—“বাসুলী আদেশে কহে কবি চণ্ডীদাসে।” পদকল্পতরুতে ইহার ভণিতায় “দ্বিজ চণ্ডীদাসে” আছে। ইহার ও পূর্ববর্তী পদের রচয়িতা একই ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়।

১৮শ পদ।

ইহার ভণিতা পদের শেষ চরণে পয়ারে—“বড়ু চণ্ডীদাস কহে যার যেবা ভায়।” ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা হইতে পারে না। ইহার ভাষাও বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে। ইহার প্রথম চরণে আছে—“পিরীতি লাগিয়া দিল্ল পরাণ নিছনি।” “পিরীতি লাগিয়া” স্থানে বড়ু চণ্ডীদাসের ভাষায় “নেহাত লাগিয়া” বসান যায়। কিন্তু “নিছনি” শব্দের পরিবর্তে অত্ৰ শব্দ বসাইলে মিল থাকে না। বড়ু চণ্ডীদাস “নিছন” শব্দ একবার ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু তাহা উৎপাত অর্থে। যথা—

না জাইব আল রাধা মথুরা নগর।

পথে দুরবার কাছাঞি নান্দের স্তন্দর ॥

নিছন লইআঁ কাছাঞি থাকু এক বাটে।

আন পথে যাইব বিকে মথুরার হাটে ॥ [শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—১ম সং, ১২০ পৃঃ]

সুতরাং পদটি জাল বড়ু চণ্ডীদাসের।

১৯শ পদ।

ইহার ভণিতা পদের শেষে—“দ্বিজ চণ্ডীদাস পুন কয়।

পরের বচনে কি আপন পর হয় ॥”

ইহা স্পষ্টতঃ দ্বিজ চণ্ডীদাসের। পদরসসারে ভণিতা অন্তরূপ—

“কাহারে কহিব সহ-মরমের কথা।

বলরামদাস বলে কি কৈল বিধাতা ॥”

পদটি বলরামদাসের হইতে পারে।

২০শ পদ।

ইহার ভণিতা পদের শেষে—

“বাসুলী আদেশে বলে চণ্ডীদাস গীত।

আপনা আপনি চিত করহ সম্বিত ॥”

ইহা কিছুতেই বড় চণ্ডীদাসের ভণিতা হইতে পারে না। এই ভণিতায় “বলে” স্থলে পদকল্পতরুতে পাঠান্তর “দ্বিজ” আছে, অল্প পুথিতে “কবি” আছে। পূর্বের ১৬নং ও ১৭নং পদের রচয়িতা এই পদের রচয়িতা হইতে পারেন। ইহার ভাষাও বড় চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে। মরম, মরমী, উচাটন (চরণের শেষে), সম্বিত (চরণের শেষে), এই শব্দগুলি বড় চণ্ডীদাসের অজ্ঞাত। বড় চণ্ডীদাস একবার উচ্চাটন শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাহা কামের উচাটন বাণ সম্বন্ধে।

“সুস্তন মোহন আর দহন শোষনে।

উচ্চাটন বাণে লজ রাখার পরাগে ॥” (২৬৮ পৃঃ)

২১শ পদ।

ভণিতা—

“চণ্ডীদাস কহে কেন এমতি করিবে।

কান্ন সে পরাণনিধি আপনি মিলিবে ॥”

ইহা বড় চণ্ডীদাসের ভণিতা হইতে পারে না। সম্পাদকদ্বয়ও দেখাইয়াছেন যে, “এমন গুণের নিধি লয়ে গেল পরে”, এই “ছত্রে অক্রুর আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া যাইবার ইঙ্গিত আছে। ক্ল-কী-তে (শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে) কিন্তু অন্তরূপ” ইত্যাদি। তবুও যে কেন তাঁহারা ইহাকে বড় চণ্ডীদাসের পদ-পর্যায়ে ফেলিয়াছেন, বুঝিতে পারিলাম না।

২২শ পদ।

ইহার ভণিতা—

“কহে বড় চণ্ডীদাস বাসুলীর বরে।

ছটফট করে প্রাণ বন্ধু নাহি ঘরে ॥”

বড় চণ্ডীদাস কোন স্থলে পয়ারে পদের উপাস্তে ভণিতা ব্যবহার করেন নাই। সুতরাং এই পদ জাল। এই অনুমান পদকল্পতরুর পাঠদ্বারা দৃঢ় প্রমাণে পরিণত হয়। তাহার পাঠ—

“কত দূরে প্রাণনাথ আছে কোন দেশ।

চম্পতি-গতি বিহু তহু ভেল শেষ ॥”

সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহভাবে চম্পতির পদ বলিয়া গ্রহণ করা যায়। অথচ সম্পাদকদ্বয় বলেন,—“পদটী নিঃসন্দেহভাবে বড় চণ্ডীদাসেরই বলিয়া মনে হয়।” এমন কি, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীর পরিশিষ্টে (৩২৫ পৃঃ) ইহাকে বড় চণ্ডীদাসের পদ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন। আমরা জানি, অত্যাশ্চর্য্য অনেক কবির পদ চণ্ডীদাসের নামে চলিয়াছে।

২৩শ পদ।

ইহার ভণিতা—

“চণ্ডীদাসে বলে কেন কহ হেন কথা।

শরীর ছাড়িলে প্রীতি রহিবেক কোথা ॥”

ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা হইতে পারে না। “প্রীতি” শব্দের প্রয়োগও বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে।

২৪শ পদ।

ইহার ভণিতা—

“চণ্ডীদাস কহে কঁাদে কিসের লাগিয়া।

সে কালা আছয়ে তার হৃদয় জাগিয়া ॥”

ইহা কিছুতেই বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা হইতে পারে না। ইহাতে দুই দুইবার “কাল” (=কৃষ্ণ) শব্দের প্রয়োগ বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে। তবে “কালু” শব্দ স্থলে অনায়াসে “কাল” করা যাইতে পারে। কিন্তু “কালু” পাঠ পাওয়া যায় নাই। সুতরাং ভণিতা-প্রমাণে ইহাকে বড়ু চণ্ডীদাসের পদ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

পরিশিষ্টের পদ

পরিশিষ্টে সম্পাদকদ্বয় ছয়টি ভণিতাহীন পদাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এগুলি বড়ু চণ্ডীদাসের। ইহাদের মধ্যে ১, ২, ৩ সংখ্যক পদাংশ শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্বাদিত বলিয়া কথিত। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের আশ্বাদিত হইলেই যে বড়ু চণ্ডীদাসের হইবে, তাহার প্রমাণ কি? কেহ বলিবেন যে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে যে, শ্রীচৈতন্য চণ্ডীদাসের পদ শুনিতে ভালবাসিতেন। কিন্তু তিনি যে কখনও অশ্লের পদ শুনিতেন না, এমন প্রমাণ কি আছে? চতুর্থ পদে চরণান্তে “বিনোদিনী” পদ আছে। ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে। পঞ্চম পদাংশ সহ সম্পূর্ণ পদ পদরসসারে বংশীবদনের ভণিতায় মিলিতেছে। সুতরাং ইহা বংশীবদনের পদ। ষষ্ঠ পদে আছে, “বৃষভানু-সুতা-তনু ছুইলে রাখালে।” সুতরাং ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের হইতে পারে না। সম্পাদকদ্বয় বলেন,—“বৃষভানুর উল্লেখ পরবর্তী কালে প্রক্ষিপ্ত”। কিন্তু পদকল্পতরুর কোনও পাঠে কিংবা অন্ত্র ইহার পাঠান্তর পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রক্ষেপের প্রমাণ কি?

চণ্ডীদাস-নামাস্কিত পদ

এই পর্যায়ে ৮৪টি পদ আছে। তন্মধ্যে ১৪ সংখ্যক পদটির ভণিতা—“বড়ু চণ্ডীদাসে গায়”। ইহা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভণিতার অনুরূপ। কিন্তু ইহার ভাব ও ভাষা বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে। ইহাতে সাদৃশ্যিক প্রেম আছে, মদনজালা নাই। এই পদের প্রথম পয়ার—“সে যে নাগর গুণের ধাম। জপয়ে তোহারি নাম ॥” শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কোথায়ও “গুণের ধাম” বা “গুণধাম” ব্যবহৃত হয় নাই। সেখানে আছে “গুণনিধি”। কিন্তু এই পাঠে মিল থাকে না। সুতরাং ইহা জাল পদ।

চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত পদপর্যায়ের কোনও কোনও পদের ভণিতায় বড়ু চণ্ডীদাসের নাম থাকিলেও যে, সেগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে বড়ু চণ্ডীদাসের নহে, এ বিষয়ে আমরা স্থযোগ্য সম্পাদকদ্বয়ের সহিত একমত।

বড়ু চণ্ডীদাসের নূতন পদ

এক্ষণে আমরা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসুর আবিষ্কৃত বড়ু চণ্ডীদাসের নূতন পদগুলি পরীক্ষা করিব [দ্রষ্টব্য—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩৯ ভাগ, ১৭৬-১৯৪ পৃঃ ; ৪০ ভাগ, ৪৩-৫৪ পৃঃ]

১ম পদ (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—৩৯শ ভাগ, ১৮০ পৃঃ)

ইহার আরম্ভ—“[ন]ন্দের নন্দন কান্ন য়ুন।” ইহার ভণিতা “বা[সুলী] বন্দিয়া আশে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাশে ॥” শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দশ অক্ষরযুক্ত ছন্দের শেষ চরণে “গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।” এই ভণিতা পাওয়া যায়। কিন্তু “বাসুলী বন্দিয়া আশে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥” এইরূপ ভণিতা নাই, স্মরণ্য ইহা জাল।

২য় পদ (১৮২ পৃঃ)

ইহার আরম্ভ—“আমি দেব শ্রীহরি। মথো[রাতে] অবতরি ॥” ইহার ভণিতা “বায়ুলি বন্দিয়া [আশে]। গাইল বড়ু চণ্ডীদাশে ॥” এই ভণিতা বড়ু চণ্ডীদাসের নহে। স্মরণ্য ইহা জাল। ভাব এবং ভাষায়ও কৃত্রিমতার প্রমাণ আছে। “শ্রামের বচন য়ুনি। মান গেল বিনোদিনির ॥” “তরুমূলে রাধাশ্রাম। দেখিতে সে অন্তপাম ॥” “[অলি সারি শুক তায়]। রাধা [কৃষ্ণ] গুণ গাএ ॥” এইগুলি বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে। “গোয়ালিনি”র স্থানে “বিনোদিনির” বিকৃত পাঠ করণা করিতে পারা যায়। ইহাতে মিলও বজায় থাকে। কিন্তু “রাধাশ্রাম”এর আসল পাঠ এমন কিছু স্থির করা যায় না, যাহাতে ছন্দ ও মিল অক্ষুণ্ণ থাকে। এ স্থানে বলা বাহুল্য যে, “বিনোদিনী”, “রাধাশ্রাম”, এইরূপ পাঠ বড়ু চণ্ডীদাসের অজ্ঞাত। শুকসারিকা রাধাকৃষ্ণের গুণ গান করে,—ইহা পরবর্তী বৈষ্ণব পদকর্তাদিগের প্রসিদ্ধি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ইহার কোনও উল্লেখ নাই।

৩য় পদ (১৮৩ পৃঃ)

ইহার আরম্ভ—“চামরি জিনিঞা তোর চিকন কবরি।” ইহার ভণিতা পদের সর্বশেষে—“গাইল বাঁড়ু চণ্ডীদাস বায়ুলির গন।” ইহা নিঃসন্দেহ বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা—“গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসুলীগণ।” আত্যন্তরিক প্রমাণেও ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের খাটি পদ বটে।

৪র্থ পদ (১৮৭ পৃঃ)

ইহার আরম্ভ—“হরিহর একু দেহ বিদিত সংসারে।” ইহার ভণিতা “বায়ুলি বন্দিয়া বাঁড়ু চণ্ডীদাসে গান।” এই ভণিতা পদের সর্বশেষে বড়ু চণ্ডীদাসের ধরণে ; কিন্তু ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের নহে। যদি কেহ বলেন, এই ভণিতা বড়ু চণ্ডীদাসের একক ভণিতা ত হইতে পারে। তাহার উত্তরে বলিব, গান = গান করেন, ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের ভাষায় অজ্ঞাত

এবং অসম্ভব। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষায় ইহা “গাস্তি” হইবে। যদি প্রকৃত পাঠ “গাস্তি” বা “গাএ” কল্পনা করা যায়, তবে মিল রক্ষা হয় না। আভ্যন্তরিক প্রমাণও বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে। প্রথমে “বিনোদিনী” শব্দ; ইহা তত মারাত্মক নয়। কিন্তু “শ্রীশঙ্কর কৃষ্ণনাম শাস্ত্রে কেন কহে”—ইহা পরবর্তী বৈষ্ণব ভাব। স্তবরাং পদটি জাল।

৫ম পদ (১৮৮ পৃঃ)

ইহার আরম্ভ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে—“আগো রাধে। সর্বক্ষে মুন্দর তৌহে।” ইহার শেষ অংশ মূতন। পদের ভণিতা—“এইখানে রশে রশে কহে বড়ু চণ্ডীদাশে গাইল জে বায়ুলির বরে ॥” শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এইরূপ ভণিতা নাই। কহে স্থানে “গাএ” কিংবা “গাইল” এরূপ পরিবর্তনও সম্ভব হইবে না। মূল পুস্তক শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ইহা খাপছাড়া ঠেকিবে। স্তবরাং ইহা জাল।

৬ষ্ঠ পদ (১৯০ পৃঃ)

ইহার আরম্ভ—“বল করিতে চাঁহঁ তোরে।” ইহার ভণিতা—“গাইল জে বোড়ু চণ্ডীদাশে ॥” ইহা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের “গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে” ভণিতার বিকৃতি মনে করা বাইতে পারে। “জে” ছন্দের বিরুদ্ধে। ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের খাঁটি পদ।

৭ম পদ।

এই পদটি মণীন্দ্রবাবুর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে উদ্ধৃত হয় নাই। কিন্তু চণ্ডীদাস-পদাবলীর সম্পাদকদ্বয় ইহা মণীন্দ্রবাবুর আলোচিত পুথি হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন (১৩, ১৪ পৃঃ)। ইহার আরম্ভ—“এক কাল হইল মোর যমুনার জল।” ইহার ভণিতা পদের সর্বশেষে—“আর কাল হইলা বটু চণ্ডীদাসে গায়ৈ”। পয়ারের শেষ চরণে এইরূপ ভণিতা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাওয়া যায় না। কিন্তু ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতার অনুরূপ বটে। স্তবরাং এই পদটি বড়ু চণ্ডীদাসের হওয়া খুব সম্ভব।

‘দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী’র পরিশিষ্ট

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় এই পরিশিষ্টে ১১টি পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার মধ্যে পাঁচটি পদকে তিনি বড়ু চণ্ডীদাসের বলিতে চাহেন। এক্ষণে এই পদগুলি পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

২ সংখ্যক পদ।

ইহার ভণিতা—“রাইয়ের নিকটে পাঠাইল দূতী।

বড়ু চণ্ডীদাস কহয়ে সতি ॥”

এই ভণিতা বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে। ইহাতে “পীরিতি” শব্দ আছে,—“যাহার যেমন পীরিতি গাঢ়া”। “নেহা” শব্দ বসাইলে ছন্দ থাকে না। স্তবরাং পদটি বড়ু চণ্ডীদাসের নয়। মণীন্দ্রবাবুও ইহাকে সন্দেহজনক বলিয়া মনে করেন।

৩ সংখ্যক পদ।

ইহার ভণিতা—“অধিক উল্লাসে সখিনী যায়।

বড়ু চণ্ডীদাস তাহাই গায় ॥”

ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা হইতে পারে না। পদে আছে—সখীর মুখে রাইয়ের দশা শুনিয়া হরি বরজ-গমনে ইচ্ছা করিলেন। এই ভাব শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিরুদ্ধে। সেখানে দূতী সখী নহে—‘বড়ায়ি’; ব্রজের নাম নাই, আছে গোকুল। “সখিনী” শব্দের প্রয়োগও বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে। মণীন্দ্রবাবু যথার্থই ইহাকে সন্দেহজনক মনে করিয়াছেন।

৬ সংখ্যক পদ।

ইহার ভণিতা—“সহচরী সনে ভণয়ে ভণ সয়ে

কহে বড়ু চণ্ডীদাস ॥”

ভণিতা “গাইল বড়ু চণ্ডীদাস” হইলে বড়ু চণ্ডীদাসের হইতে পারিত। কিন্তু আভ্যন্তরিক ভাব বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে। “যাও সহচরী মথুরা মণ্ডলে, বলিও আমার কথা ॥” এই পরিকল্পনা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অজ্ঞাত। মণীন্দ্রবাবুও ইহাকে সন্দেহজনক মনে করেন।

৮ সংখ্যক পদ।

ইহার ভণিতা—“বাস্তুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে ॥

দুখ দূরে গেল সুখবিলাসে ॥”

উপাস্তে ভণিতা বড়ু চণ্ডীদাসের হইতে পারে না। বিশেষতঃ “বাস্তুলী আদেশে” বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতার ধারা নহে। “অবলা” শব্দের প্রয়োগও বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে। “চণ্ডীদাস-পদাবলী”তে ইহাকে চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত পদের পর্যায়ে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

৯ সংখ্যক পদ।

ইহার আরম্ভ—“ও পারে বঁধুর ঘর বৈসে গুণনিধি ॥” ইহার সমালোচনা “চণ্ডীদাস-পদাবলী”র বড়ু চণ্ডীদাসের ২২ সংখ্যক পদে করা হইয়াছে। সেখানে দেখান হইয়াছে যে, ইহা কবি চম্পতির রচিত।

উপসংহার

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বাহিরে বড়ু চণ্ডীদাসের পদ নাই। আমরা তাঁহার যে সকল খাঁটি পদ পাইয়াছি, তাহা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অপ্রাপ্ত অংশে ছিল বলিয়া মনে করিতে হইবে। বড়ু চণ্ডীদাস বিক্ষিপ্ত কবিতা হিসাবে পদাবলী রচনা করেন নাই। তাঁহার পদগুলি ধারাবাহিক কৃষ্ণলীলার অন্তর্গত ॥*

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

৩৭
১৭

‘বড়ু চণ্ডীদাসের পদ’ সম্পর্কে বক্তব্য

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক “চণ্ডীদাস-পদাবলী”র সম্পাদন-কার্যে নিযুক্ত হইয়া, আমরা যথাশক্তি “চণ্ডীদাস” এই নামে প্রচলিত পদসমূহ সংগ্রহ ও পর্যালোচনাপূর্বক, “চণ্ডীদাস”-সমগ্রা সম্বন্ধে আমাদের উপস্থিত জ্ঞান-মত “চণ্ডীদাস-পদাবলী”-র শ্রেণী-বিভাগে প্রবৃত্ত হই। “চণ্ডীদাস”-রচিত বা ভণিতা-যুক্ত পদ আলোচনা করিয়া, একাধিক “চণ্ডীদাস”-এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের মত স্পষ্ট হয়। আমাদের বিশ্বাস, অন্ততঃ তিন জন “চণ্ডীদাস” ছিলেন। ইহাদের উপনাম বা উপাধি অনুসারে ইহাদিগকে [১] “বড়ু”, [২] “বিজু” ও [৩] “দীন” নামে পৃথক্ রূপে পরিচিত করিতে হয়। “বড়ু” ছিলেন আদি বা প্রথম চণ্ডীদাস, এবং ইনি চৈতন্যদেবের পূর্বগামী ছিলেন, চৈতন্যদেব ইহারই রচিত পদ আশ্বাদন করিতেন; সনাতন গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের বৃহত্তোষী টীকার ইহারই নাম করিয়া গিয়াছেন। “বিজু” ও “দীন” চণ্ডীদাসদ্বয় চৈতন্যদেবের পরবর্তী যুগের; ইহাদের মধ্যে “দীন” চণ্ডীদাসের ব্যক্তিত্ব শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১৩৩৩ সালের পৌষের “ভারতবর্ষ” পত্রিকায় ও তদনন্তর ১৩৪২ সালের বৈশাখ-সংখ্যার “বঙ্গশ্রী” তে, এবং শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম-এ কর্তৃক ১৩৩৩ সনের চতুর্থ সংখ্যার “সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা”-তে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় “দীন”-চণ্ডীদাসের পদ, প্রচলিত চণ্ডীদাস-পদাবলী হইতে নির্বাচিত করিয়া পৃথক্ করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন (“দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী”, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত)। এরূপ চেষ্টা আমাদের আরও “চণ্ডীদাস-পদাবলী”র সংস্করণেরও অঙ্গীভূত, আমাদের প্রকাশিত প্রথম খণ্ডেই তাহার সূচনা করিয়াছি। “বিজু”-চণ্ডীদাসের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা এখনও নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই; এবং “চণ্ডীদাস-পদাবলী” সম্পাদন আরম্ভ করিবার কালে আমাদের অনুমান সম্বন্ধে আমরা আরও সন্দিগ্ধ ছিলাম বলিয়া, “বিজু”-চণ্ডীদাস-রচিত পদ তথা অত্র কবির রচিত চণ্ডীদাস-ভণিতাযুক্ত পদ, “চণ্ডীদাস-নামাস্কৃত” শ্রেণীতে ফেলিয়াছিলাম।

এই তিন চণ্ডীদাসের মধ্যে “বড়ু”-কে পৃথক্ করার চেষ্টা আমাদের সংস্করণের লক্ষ্যগৌরবৈশিষ্ট্য। এ সম্বন্ধে আমরা “বড়ু”-চণ্ডীদাস-রচিত “শ্রীকৃষ্ণকীর্তন” গ্রন্থকে প্রমাণ বা কণ্ঠিপাথর স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের বক্তব্য-সম্মত আমাদের সম্পাদিত সমগ্র “চণ্ডীদাস-পদাবলী”, এক সঙ্গে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আমাদের ছিল; তাহা করিতে পারিলে পাঠক ও সমালোচকগণের পক্ষে সুবিধা হইত। সাধারণ পাঠক এই একাধিক চণ্ডীদাসের প্রস্তাবনায় একটু যে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য। সেই জন্ত বোধ হয়, আমাদের “চণ্ডীদাস-পদাবলী”র ভেতন উপযোগী সমালোচনা আমরা দেখি নাই। বিষয়টী যেরূপ জটিল, তাহাতে ইহার সম্যক্ আলোচনা উপস্থিত ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞগণেরই অধিকার-ভুক্ত

থাকিবে। বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ বিষয়ে সার্থক গবেষণা করিয়া অল্প যে কয়জন ব্যক্তি এই অধিকার লাভ করিয়াছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা বিভাগের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। স্মরণ্য আমাদের পক্ষে পরম আনন্দের বিষয় যে, চণ্ডীদাস-সমস্তার নিরসনে যে প্রয়াস আমরা করিয়াছি, শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্ সাহেব তৎসম্বন্ধে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রচলিত “চণ্ডীদাস”-পদাবলীর পদগুলির মধ্যে যেগুলিতে ভাবে, ভাষায়, ছন্দে, অলঙ্কারে “বড়ু”-চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদের সঙ্গে মিল আমরা পাইয়াছি, সেই মিল বিচার করিয়া পদাবলীর পদ-বিশেষ “বড়ু”-চণ্ডীদাস-রচিত কি না, তাহা স্থির করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমরা আমাদের বিচার-পদ্ধতি অনুসারে, প্রচলিত সহস্রোদ্ধার পদ-মধ্যে মাত্র ২৪টিকে “বড়ু”-চণ্ডীদাসের বলিতে সাহসী হইয়াছি। আমাদের পদ্ধতি আমরা অত্যন্ত সতর্কতার সহিত অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়াছি। যাহারা “চণ্ডীদাস” নামে রামীর সাধন-সহচর কোনও সাধককে বাঙ্গালা বৈষ্ণব-সাহিত্যের এক দেবতা-রূপে স্থাপিত করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এই পদ্ধতি অনুমোদন লাভ করিবে না, এবং প্রচলিত শত শত পদের মধ্যে মাত্র ২৪টি পদ আদি বা “বড়ু”-চণ্ডীদাসের বলিয়া তাঁহাদের সমক্ষে ভেট দিলে, এই সংখ্যান্নতা তাঁহাদিগকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিবে; বিশেষতঃ যখন এই অল্প সংখ্যার মধ্যে তাঁহারা অনেকগুলি লোকপ্রিয় “চণ্ডীদাস”-রচিত পদ পাইবেন না। কিন্তু অপর পক্ষে, ভাষাতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্ সাহেব আমাদের প্রস্তাবিত এই চকিষাটী পদের দুই একটি ভিন্ন অপরগুলিকেও “বড়ু”-চণ্ডীদাসের খাতে ফেলিতে নারাজ। এক হিসাবে, আমাদের পদ্ধতি তিনি আরও অনেক অধিক সতর্কতার সহিত চালাইতে চাহেন; স্মরণ্য পদ্ধতি তাঁহার অনুমোদন পাইয়াছে, ইহা ধরিয়া লইতে হয়।

কিন্তু আমাদের মনে হয়, শহীদুল্লাহ্ সাহেব যে-সব আপত্তি তুলিয়াছেন, সেগুলি এই অতিসতর্কতা-প্রসূত, এবং একদেশদর্শী। তিনি ভণিতার উপরেই বড় বেশী জোর দিয়াছেন—বড় বেশী কেন, প্রায় সম্পূর্ণরূপেই নির্ভর করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বাহিরে অল্প কোনও ভণিতা পাইলে, তাহা মানিতে তিনি রাজী নহেন। অথচ প্রভূত পরিশ্রম করিয়া এই এক শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভণিতার যে তালিকা তিনি কষিয়া দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, ৬১ রকম ভণিতা (অবশ্য প্রায় সর্বত্রই “চণ্ডীদাস”, “বড়ু”, ও “বাসলী”—এই নামগুলি আছে) প্লাওয়া যাইতেছে। এই ৬১ প্রকার ভণিতার বাহিরে আরও দুই পাঁচটি অল্প ধরণের ভণিতা যে ছিল না এবং পাওয়া যাইবে না, এরূপ বলা অযুক্তিযুক্ত। তাহার পর, ভণিতার বিস্তৃতি আমরা সর্বত্র আশা করিতে পারি না। কীর্তনবিদ্যার স্ববিধা অনুসারে গানের সুর, তাল ও কথা সবই বদলাইয়া গিয়াছে, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ভণিতায় “বড়ু” হইয়া গিয়াছেন “বিজ”, “বিজ” হইয়া গিয়াছেন “বড়ু”—বহু স্থলে এরূপ হইয়াছে। যদি পদটির মধ্যে ভাবে, ভাষায়, বিষয়-বস্তুর অবতারণার প্রকারে, অলঙ্কারে আমরা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে ঐক্য পাই, তাহা হইলে ভণিতাকে গোণ করিয়াই দেখিতে হয়। আমরা যে ২৪টি পদ “বড়ু”র বলিয়া মনে করিয়াছি, সে কয়টির প্রত্যেকটির নীচে কি কি বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সহিত সামঞ্জস্য আমরা পাইয়াছি, তাহার উল্লেখ করিয়াছি। তথাপি যখন শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্ সাহেব

প্রত্যেক পদটি লইয়া বিচার করিয়াছেন, আমরাও তাহা করিব। তবে “চণ্ডীদাস”-পদাবলীর হাজার বার শ’ পদ আলোচনা করিয়া দেখিয়া ভণিতাকে আমরা একটি স্থান দিলেও, প্রধানতম স্থান দিতে রাজী নহি। এ কথা মনে রাখা দরকার যে, প্রচলিত পদাবলী-সাহিত্যে “বড়ু”র রচিত যে কয়টি পদের স্থান পাওয়া সম্ভব হইয়াছে, সে কয়টি নিশ্চয়ই অত্যন্ত লোকপ্রিয় হইয়া পড়ায়ই এইরূপ হইয়াছে ; এবং লোকপ্রিয় পদের ভণিতা লইয়া যে কত গোলযোগ, তাহা আমাদের ধৃত “চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত” পদশ্রেণীর পারিশিষ্ট-রূপে প্রদত্ত পদগুলির ভণিতা আলোচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে।

শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ সাহেব শ্রীকৃষ্ণকীতনের ভণিতা সম্বন্ধে যে একটি কথা বলিয়াছেন, তাহা মানিয়া লইতে পারিতেছি না। বড়ু চণ্ডীদাস যে কেবল “চণ্ডীদাস গাইল” বা “বড়ু চণ্ডীদাস গায়”—এইরূপ সামান্ত বা নিরপেক্ষ উক্তি-তেই নিজের পদ শেষ করিয়াছেন, বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে নিজের আত্মীয়তা প্রকট করেন নাই, অথবা রাধা বা শ্রীকৃষ্ণ, ইহাদের উভয়ের কাহাকেও আহ্বান করিয়া বা উদ্দেশ্য করিয়া স্বনামে কিছু বলেন নাই, এ কথা ঠিক নহে। শ্রীকৃষ্ণকীতনের দুই একটি ভণিতায় বেশ বুঝা যায়, পরবর্তী চণ্ডীদাস-পদাবলীর অনুরূপ ভণিতা বড়ু-ও ব্যবহার করিতেন। যথা—

কাহ্নের বিলাপ বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ল,
পাআঁ দেবী বাসলীর বরে ॥ (পৃঃ ২৮৮)

(এখানে “গাএ” ক্রিয়ার কর্ম “কাহ্নের বিলাপ”)।

সহজ হৈব তোর চন্দ্রাবলী বসে।

জিআঅ রাধাক গাইল চণ্ডীদাসে ॥ (পৃঃ ২৮৬)

(এখানে “জিআঅ রাধাক” অক্ৰেমে চণ্ডীদাসের উক্তি বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে পারি)।

এতদ্ভিন্ন, ভণিতার পরেও শ্রীকৃষ্ণকীতনে দুই এক ছত্র—যথা একটি পয়ার—পাইতেছি। ইহারই অবলম্বনে পরবর্তী অনুলেখক বা কীতনিরার হাতে মূল ভণিতার বিকৃতি ও বাছল্য হইয়া থাকিতে পারে। যথা—

গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বর।

তখনে রাধাক দিল মেলানি।

নাচিত্তে গাইতেন বুলে চক্রপাণী ॥ (পৃঃ ২৯২)

এতৎসম্পর্কে, শ্রীকৃষ্ণকীতনে প্রাপ্ত “দেখিলোঁ প্রথম নিশি” ইত্যাদিক পদটি (আমাদের বইয়ের তৃতীয় পদ) ও পরবর্তী কালের পদাবলীতে রক্ষিত তাহার রূপান্তর, এই উভয়ের ভণিতাগুলি মিলাইয়া দেখিতে পারা যায়। “রস” এই শব্দটি দ্বারা পরবর্তী রূপান্তরগুলিতে ভণিতা পূর্ণ ও ছন্দোবিষয়ে নির্ভুলরূপেই পাইতেছি ; প্রাচীন রূপে “রস গাইল” রূপ ছিল কি না, কে জানে।

শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ সাহেব “বড়ু”-চণ্ডীদাসের পদ-নির্বাচনের দ্বিতীয় পন্থস্বরূপ এই সকল পদগত ভাব-আলোচনার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ঠিক “ভাব” ধরেন নাই—তিনি

বিষয়-বস্তুকেই (অর্থাৎ কৃষ্ণলীলার প্রসঙ্গের ব্যক্তি ও ঘটনাকেই) ভাব বলিয়া ধরিয়াছেন। শ্রীরাধার পিতামাতার নাম কি ছিল, তাঁহার নামান্তর যে চন্দ্রাবলী ছিল, “বড়ু”, “দ্বিজ” ইত্যাদির পদের পৃথক্ববিধানের অল্প এ সমস্ত অবশ্য প্রথম শ্রেণীর প্রমাণ, কিন্তু এগুলি ভাব-বিশ্লেষণত প্রমাণ নহে। আমাদের স্বরণ রাখা কতব্য যে, শ্রীকৃষ্ণকীতনে রাধা ও শ্রীকৃষ্ণের যে চরিত্র আমরা পাই, এবং তাঁহারা যে ভাবে তখনকার বৈষ্ণবদের চিত্র আকৃষ্ট করিয়া-ছিলেন, তাহা চৈতন্যযুগের পূর্ববর্তী আদি বৈষ্ণবযুগের কথা। চৈতন্যযুগের পূর্বেকার ভাবধারা যে পরবর্তী রসবিচার ও রস-সাহিত্য-পুষ্টি স্থম্বতর বৈষ্ণব ভাবধারা হইতে বিভিন্ন ছিল, তাহা বলা বাহুল্য। পরবর্তী বৈষ্ণব কবি ও আচার্য এবং কীর্তনিয়াগণ যে আদি-কবি “বড়ু”-চণ্ডী-দাসের পদ ভুলেন নাই, চৈতন্যদেব-প্রদর্শিত পথে তাঁহারাও যে “বড়ু”-র পদ আশ্রয়ন করিতেন, অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিতেন, তাহার প্রমাণ প্রচলিত পদাবলী-সাহিত্যে স্পষ্ট। চণ্ডীদাস-ভণিতাযুক্ত বহু পদকে “বড়ু”-র রচিত বলিতে না পারিলেও, সেগুলিতে আমরা বড়ুর ভাবের ছায়া, ঝটিক বা ভাষার স্বাক্ষর পাইতেছি। এরূপ স্থলে, যেখানে যেখানে শ্রীকৃষ্ণকীতন-স্থলভ ভাবধারা বা ভাবপারম্পর্য দেখি, সেখানে যদি ভাষায়ও তাহার সমর্থন পাই, আমরা সেখানে মূলতঃ “বড়ু”-রই পদ পাইতেছি, তাহা ধরিয়া লইতে পারি। ভাব-বিষয়ে একটা কথা প্রশ্নবিধানযোগ্য; “বড়ু”-র শ্রীকৃষ্ণকীতনে রাধা-বিরহখণ্ডের বিরহের পদগুলিই ভাবে গভীরতম, উচ্চতম; অম্বরূপ বিরহ-বিষয়ক পদই ভাষায় ও ছন্দে (পয়ার ছন্দ এইপ্রকার পদে বেশী করিয়া প্রযুক্ত দেখি) শ্রীকৃষ্ণকীতনের সমপর্যায় হওয়ার, ঐ পদগুলিকেই বিশেষ ভাবে “বড়ু”-র বলিয়া ধরিয়া লইতে আমরা প্রণোদিত হইয়াছি। এই “বিরহ” পর্যায়কেই পরবর্তী কালে “আক্ষেপানুরাগ” এই নূতন আখ্যা দেওয়া হইয়াছে; এবং “চণ্ডীদাস”-ভণিতাযুক্ত ঐ পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ পদগুলির মূল উৎস হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণকীতনের বংশী-খণ্ডের ও বৃন্দাবন-খণ্ডের কয়েকটা পদ, এবং রাধাবিরহ-খণ্ডের পদ। এরূপ বিরহ-বিষয়ে “বড়ু”-র রচিত শ্রীকৃষ্ণকীতন-বহির্ভূত অল্প পদ, প্রচলিত পদাবলীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে, এরূপ অনুমানের পক্ষে প্রবল যুক্তি আছে

শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ সাহেব বলিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণকীতনে “রাধার পূর্বরাগ নাই, বরং পরম বিরাগ আছে।” কথাটা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণীয় নহে। আদিত্যে রাধার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিরাগ দেখান হইলেও, সে বিরাগ ক্রমে মৌখিক বিরাগে যে দাঁড়াইয়াছে, তাহার প্রমাণ শ্রীকৃষ্ণকীতনেই আছে; এবং পরে আমরা বংশীখণ্ড ও শেষের অল্প অংশে দেখিতে পাই যে, সেই প্রারম্ভিক বিরাগাভাস শেষে গভীর অমুরাগে পর্যবসিত হইয়াছে। আমরা অল্প পর্যায়-আখ্যার অভাবে, “শ্রীরাধার পূর্বরাগ” শীর্ষক প্রচলিত পর্যায়ের যে পদটির স্থান দিয়াছি (আমাদের “চণ্ডীদাস-পদাবলী”-র “বড়ু”-চণ্ডীদাসের পদমধ্যে প্রথম পদ), তাহাকে অক্লেশে শ্রীকৃষ্ণকীতনের বংশীখণ্ডের প্রথম কয়েকটা পদের মধ্যে স্থান দেওয়া যায়, —ভাবের ব্যত্যয় হয় না।

আমাদের নির্বাচিত “বড়ু”-র পদে রাধার সখী বা শ্রীকৃষ্ণের সখার নাম নাই।

তাষা সম্বন্ধে শহীদুল্লাহ সাহেব যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমরাও স্বীকার করি। “পিরীতি” শব্দ শ্রীকৃষ্ণকীতনে চারি বার আছে, একবার নহে—পৃঃ ১৬২, পৃঃ ২৭৯,

পৃঃ ৩২৮ (শহীদুল্লাহ সাহেব-ধৃত) ও পৃঃ ৩৮২। তবে আমাদের বক্তব্য, যখন আমরা নকলনবিস ও গায়কের মারফৎ প্রাচীন পদের অল্প-বিস্তর বিকৃতির সম্ভাবনা মানিয়াই লইতেছি, তখন পরবর্তী কালে বহুল-প্রচলিত “বিনোদিনী”, “শ্রাম”, “পিরীতি” প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অপ্রাপ্ত বা অল্প অর্থে প্রাপ্ত শব্দ “বড়ু-”র পদে যে স্থান করিয়া লইবে, উহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। আমাদের নির্বাচিত ২৪টি পদকে আমরা যথাযথ “বড়ু-”র স্বস্থ-লিখিত বা স্বমুখ-গীত রচনার অবিকৃত রূপ বলিতেছি না—আমরা কেবল এইটুকুই বলি যে, আক্ষরিক ভাবে নহে, মোটামুটি ভাবে এই পদগুলিতে বড়ুরই রচনা আমরা পাইতেছি। সমসাময়িক পুথি না পাইলে, প্রাচীন বাঙ্গালা কবির রচনা-সম্বন্ধে ইহার বেশী আর কিছু বলা চলে না।

এক্ষণে “বড়ু-চণ্ডীদাসের বলিয়া গৃহীত ২৪টি পদ সম্বন্ধে শহীদুল্লাহ সাহেবের অভি-
মতের আলোচনা একাদিক্রমে করিব।

প্রথম পদ—ইহাকে পূর্বরাগের পর্যায়ে আমরা ফেলিয়াছি বলিয়া শহীদুল্লাহ সাহেব যে আপত্তি করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমরা উপরে আমাদের বক্তব্য বলিয়াছি। “পূর্বরাগ” এই পর্যায়-আখ্যা আমাদের দেওয়া। উহাতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বংশী-খণ্ডের পদের সহিত সামঞ্জস্য বিদ্যমান। অল্প নাম বা বর্ণনার অভাবে “পূর্বরাগ” বলিয়া ধরা হইয়াছিল। নিয়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের একটি পদ তুলিয়া দিলাম, শহীদুল্লাহ সাহেব উহাকে কোন্ পর্যায়ের ফেলিবেন?—

বাছ তুলিলে কেশ বন্ধন ছলে।

ঘন ঘন বিকাশিলে বদনকমলে ॥

আঙ্গভঙ্গে কৈলে কেছে মোর বিদ্যমানে।

এবে আলিঙ্গন দিআ রাখহ পরাণে ॥—ইত্যাদি (পৃঃ ২৪৩, যমুনা-খণ্ড)।

রসশাস্ত্রের বিচারে এই পদকে “পূর্বরাগ” পর্যায়েই ফেলিতে হয়। তদনুরূপ আর একটি অংশের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। পৃঃ ২৩৮—

নেহে তবে আকুলী রাখিকা ততিখনে। নিমেষবরহিত বঙ্গ সরস নয়নে ॥

দেখিল কাহ্নের মুখ স্মৃতির সময়ে। সকল লোকের মাঝে তেজি লাজভয়ে ॥

কাহ্নাঞি দেখিআ আর যত গোপীগণে। সন্ধে আলিঙ্গন কৈল আপণ আপণে ॥

“শ্রামবর্ণ দেবা-তনু” ইত্যাদি অংশকে আমরা “বড়ু” চণ্ডীদাসের বলিয়া মনে করি না। ইহা পরবর্তী কালের পাঠবিকৃতি-জাত বলিতে হইবে। কিন্তু তৃতীয় ত্রিপদীর শেষ অংশ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যুগের আদিমতার পরিচায়ক (“বাড়িয়া ভাঙ্গিবে তোর মাথা”)।

চতুর্থ পদ—এখানে শহীদুল্লাহ সাহেব ভণিতায় আপত্তি করিয়াছেন। ছন্দের অমুরোধে যে অপরিচিত নাম বাদ দেওয়া যাইতে পারে, বিশেষতঃ পালা গানে, এ কথা শহীদুল্লাহ সাহেব যদি না মানেন, তাহা হইলে আমরা নাচার। এই উৎকৃষ্ট পদটিতে প্রাচীন রচনার ও প্রাচীন ভাষার ছাপ স্পষ্ট; ইহার ভাষাকে বানানে ও দুই-একটি প্রাচীন প্রতিকল্প আনিয়া পরিবর্তিত করিয়া দিলে, ইহাকে সহজেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাখাবিরহ-খণ্ডের মধ্যে স্থান

দিতে পারা যায়। পূর্বেই বলিয়াছি, ভণিতার প্রমাণ অত্যন্ত প্রমাণ হইলেও, প্রধান প্রমাণ নহে। “কান্ন, মুগ্ধী, বাঢ়য়ে, বাজিছে, দারুণ, রা, বৈরী বাসিয়ে, ছাড়িয়ে” পদগুলি এবং পদের মধ্যে “গো” (= শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের “গ”) শব্দ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষাকেই স্বরণ করাইয়া দেয়।

পঞ্চম পদ—ভণিতার কথা ছাড়িয়া দিলে, শহীদুল্লাহ্ সাহেবের এই পদে আপত্তি ইহার ভাব লইয়া। এই পদটির প্রথম অংশটীতে (প্রথম তিনটি পয়ারে) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাব বিদ্যমান, তুলনীয়—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, নৌকা-খণ্ডের প্রথম পদ (১৩৯ পৃঃ)। ভাব ও শব্দের প্রতিধ্বনিও প্রথম দুই পয়ারে আছে। শেষ তিনটি পয়ার সম্বন্ধে আমরা জোর দিতে চাই না—এখানে পরবর্তী কালে পরিবর্তন বা পরিবর্ধন হওয়া অসম্ভব নহে।

ষষ্ঠ পদ—আমাদের মনে হয়, এই পদ সম্বন্ধে কোনও আপত্তি টিকিতে পারে না। উপরে চতুর্থ পদ সম্বন্ধে আমাদের কৈফিয়ৎ দ্রষ্টব্য। ভাবে, ভাষায়, ছন্দে, উহা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেরই পদ হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সহিত সাদৃশ্য আমরা পদের আলোচনার শেষে দেখাইয়াছি।

এই পদে “বাথান” পাঠ আমাদের গৃহীত পাঠে রাখিয়াছি। কারণ, “বাথান” হইলে পরবর্তী “পাতর” শব্দের সার্থকতা আইসে, এবং “পাথারে” অপেক্ষা “পাতরে” পাঠটাই সম্ভব ও অধিকতর অর্থতোতক। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পথে বাটে শ্রীকৃষ্ণ কতক লাক্ষিতা হইবার অনুযোগ রাখা করিতেছেন, যথা—

পথত বারহ মন নান্দের নন্দন।...

ঘাটে ঘাটে হেন কেহে বোল চক্রপাণী ॥ (পৃঃ ২৫১)।

আমরা এই পদটী “নিঃসন্দেহভাবে বড়ু-চণ্ডীদাসের” কি না, তৎসম্বন্ধে অত্র সুধীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

সপ্তম পদ—ভণিতার সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব উক্তি দ্রষ্টব্য। পদটির অনুরূপ ছত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হইতে এবং মণিঙ্গ বাবুর নবাবিকৃত পুথি হইতে আমরা উদ্ধার করিয়া দিয়াছি। ইহা বড়ু-চণ্ডীদাসেরই—তবে ভণিতা পরবর্তী কালের হওয়া সম্ভব।

অষ্টম পদ—ভণিতা ভিন্ন ইহাকে বড়ুর বলিতে শহীদুল্লাহ্ সাহেবের আপত্তি নাই।

নবম ও দশম পদ—ভণিতা ভিন্ন অত্র দিক্ দিয়া শহীদুল্লাহ্ সাহেব এই পদের বিচার করেন নাই। তদনুরূপ দশম পদটীকে বড়ুর বলিয়া গ্রহণ করিতে শহীদুল্লাহ্ সাহেবের আপত্তি নাই।

একাদশ, ত্রয়োদশ পদ—ভণিতায় আপত্তি। পূর্বমন্তব্য দ্রষ্টব্য। ত্রয়োদশ পদের ছত্রের সহিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছত্রের ভাব-গত ঐক্য লক্ষণীয়।

চতুর্দশ পদ—এখানেও মূলতঃ ভণিতায় আপত্তি। ভাষায় আপত্তি হইতে পারে না; কতকগুলি শব্দ প্রাচীন বাঙ্গালায় লক্ষণীয়। “কান্ন” = “কাহ্ন” আছে; “কালী” শব্দ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে; যথা—“আকারণে আল রাখা নিন্দসি কৃষ্ণ কালী”; “অভাগি” পাইতেছি, “অভাগিনী” অর্বাচীন রূপ; “কেনে” = “কেহে”; “অবলা” না থাক, “অবল” শব্দ

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে। একমাত্র “হেদে” শব্দ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাই না; কিন্তু তাহাতেই এই পদকে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। চৈতন্যদেবের আশ্বাদিত পদ; দ্বিশতাব্দিক বৎসর পূর্বকাল কাগজে চণ্ডীদাসের ভণিতায় পূরণ করিয়া দেওয়া। সহজে ইহাকে বাদ দেওয়া চলিবে না।

পঞ্চদশ পদ—ভণিতার কথা ধরিলাম না—কিন্তু এই পদের ভাষার প্রাচীনত্ব শহীদুল্লাহ সাহেব যে উপেক্ষা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা আশ্চর্যবিত হইতেছি। “ননদী (ননদিনী নহে), দুখ বাসি, কালা কানু”, এগুলি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রতিধ্বনি। “আগি” শব্দ প্রাকৃতজ্য তদ্ভব রূপ—অর্ধতৎসম “আগুনি, আগুন” অপেক্ষাও ভাষায় প্রাচীনতর রূপ (*অগ্নিকা > অগ্নিগআ > অগ্নিগঅ > আগী, জ্বলিঙ্গে)—চর্যাপদে “আগী” মিলে; এই প্রাচীন রূপকে শহীদুল্লাহ সাহেব এই পদের প্রাচীনত্বের অন্তরায়-স্বরূপ মনে করিতেছেন। “পিরীতি”—“নেহার” বা (স্নেহের) এইরূপ কোনও পুরাতন শব্দের পরিবর্তে আসিয়া থাকিতে পারে।

ষোড়শ ও সপ্তদশ পদ—ষোড়শ পদে শহীদুল্লাহ সাহেবের প্রস্তাবিত ভণিতার পাঠ সমীচীনতর। এই পদদ্বয়ের ভাব শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদেও মিলিতেছে; ভণিতায় “বাসলী”র নামও আছে। আমরা বড়ু-চণ্ডীদাসের বলিয়া গ্রহণ করিবার বিরুদ্ধে আপত্তি করিবার কিছু দেখিতেছি না।

অষ্টাদশ পদ—“নিছন—নিছনি”, একই শব্দের রূপান্তর। পদটীতে “কানু” আছে, “নিছিয়া” শব্দ আছে (তুলনীয় “নিশিবো”—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন), “আরতি” আছে—এগুলি বড়ু-চণ্ডীদাসেরই আরক। ভণিতায়ও কেবল “বড়ু”—চণ্ডীদাস পাইতেছি। ভাবে ও ভাষায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-রচয়িতার হইতে বাধা দেখি না। এই পদস্থিত “পিরীতি” শব্দের সম্ভাব্য সমাধান শহীদুল্লাহ সাহেবই করিয়া দিয়াছেন।

উনবিংশ পদ—পদটির ভাব, ভাষা, ছন্দ, তিনই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনুরূপ। আপত্তি “শ্রাম” ও ভণিতার “দ্বিজ”; এই শব্দদ্বয়ে। অত্র প্রমাণ বলবত্তর।

বিংশ পদ—“মরম” শব্দটা একাধিক বার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে; যথা—

এতের মরম আইহণের মাএ জাণে।

“উছাটিন”, “উচাটন” শব্দের প্রাচীনতর, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনানুসৃত রূপ হইতে পারে। কিন্তু “ঘুণে”র সহিত “উচাটনে”র মিল হইলে, “উছাটিনে”র সহিতও হইতে বাধা নাই। ভণিতার “বাসলী” শব্দ লক্ষণীয়। উনবিংশ পদের সম্বন্ধে মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

একবিংশ পদ—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সম্পূর্ণ রাধাকৃষ্ণলীলা পাওয়া যাইতেছে না। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাইবার পরের অংশ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে খণ্ডিত। আমাদের মন্তব্যের দ্বারা মূল পদের ভাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অসুগমিতা খণ্ডিত হয় না।

দ্বাবিংশ পদ—চম্পতিপতির ভণিতা সম্বন্ধে উক্ত পদের নিম্নে আমাদের মন্তব্য দ্রষ্টব্য। আজ পর্য্যন্ত চম্পতি-ভণিতায় কোনও বাঙ্গালা পদ পাওয়া যায় নাই, উপরন্তু আমাদের আলোচিত তিনখানি পুথিতে ইহা চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাইয়াছি। এই ভণিতা পাল্টাইয়া

দিলে বোধ হয়, শহীদুল্লাহ সাহেবের আপত্তির মুখ্য কারণ দূর হইবে, এবং তাহা হইলে সমস্ত পদটাই শ্রীরাধিকার উক্তি হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু উপাস্ত ছত্রে বা উপাস্ত পর্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনেও বড়ু-চণ্ডীদাসের ভণিতা আছে, তাহার দৃষ্টান্ত আমরা পূর্বেই দিয়াছি। এই পদের দুই একটি ছত্রও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে, আমরা তাহা আমাদের টিপ্পনীতে দেখাইয়াছি। “পাখী হঞা উড়ি যাও” ইত্যাদি—এই ভাবের পংক্তি বড়ু-চণ্ডীদাসের প্রিয় ছিল, একাধিক বার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ইহা মিলে।

ত্রয়োবিংশ পদ—পূর্ব পূর্ব পদের সম্বন্ধে আমাদের উক্তি দ্রষ্টব্য।

চতুর্বিংশ পদ—ভণিতায় আপত্তি। ভাবে পদটী যে “অপেক্ষাকৃত আধুনিক-গম্ভীর”, তাহা আমরা আমাদের মন্তব্যে স্বীকার করিয়াছি।

পরিশিষ্টের পদ—এই পদ বা পদাংশগুলিকে বড়ু চণ্ডীদাসের বলিয়া জোর করা চলে না, সেই জন্তই আমরা এগুলিকে “পরিশিষ্ট” শ্রেণীতে ফেলিয়াছি। তবে প্রত্যেক পদ বা পদাংশের নীচে আমাদের বক্তব্য বলিয়াছি, তদ্বারাই শহীদুল্লাহ সাহেবের কোনও কোনও আপত্তি খণ্ডিত হইবে।

বড়ু-চণ্ডীদাসের নূতন পদ

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসুর আবিষ্কৃত পুথি হইখানিতে যে কয়টি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদের নূতন রূপ ও অর্থ পদ পাওয়া গিয়াছে, সে পদগুলি সম্বন্ধে কেবল এই কথাই বলা যথেষ্ট যে, এগুলি পরবর্তী কালের বিকৃত পাঠ্যময় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-স্বত ও বড়ু-চণ্ডীদাসের রচিত অর্থ পদের সংগ্রহ, স্মরণ্য এগুলিতে যে পরবর্তী ও বড়ু-চণ্ডীদাসের অজ্ঞাত বহু শব্দাদি থাকিবে, তাহা বিচিত্র নহে।

“বড়ু”-চণ্ডীদাস যে কেবল পালা হিসাবেই লিখিয়াছিলেন, বিক্ষিপ্ত বা স্বতন্ত্র পদ লেখেন নাই, সে বিষয়ে জোর করিয়া কি বলা চলে?

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

শ্রীশ্রুতীকুমার চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্য-বার্তা

[যে জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষদগ্রন্থাবলী ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় সাধারণতঃ প্রকাশিত হইয়া থাকে, মৌলিক আলোচনার নিদর্শন-সংবলিত ও বহুভাষায় নানা স্থানে প্রকাশিত সেই জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ, তথা বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত বঙ্গভাষা ও সাহিত্যাদিবিষয়ক সেই জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার 'সাহিত্য-বার্তা' অংশে প্রতি তিন মাস অন্তর প্রকাশিত হইবে। এই অংশকে পূর্ণাঙ্গ ও বিপুল করিবার জন্ত—ইহাকে বাঙ্গালা ভাষার সমসাময়িক মৌলিক আলোচনার নিখুঁত ইতিবৃত্ত করিয়া তুলিবার জন্ত সাহিত্যিকবর্গের সহযোগিতা ও সাহায্য বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করা যাইতেছে।—
পত্রিকাধ্যক্ষ।]

সাহিত্য

গ্রন্থ

বাংলা বানানের নিয়ম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কতৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই আনা।
শ্রীশ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-লিখিত ভূমিকা সহ বিশ্ববিদ্যালয় কতৃক নিখুঁত সমিতির অভিমত।

প্রবন্ধ

শ্রীঅনাথগোপাল সেন—পূর্ববঙ্গের গ্রাম্য বাউল-সঙ্গীত। ভারতবর্ষ, আষাঢ় '৪৩, পৃঃ ১২০।

পূর্ববঙ্গের পল্লীপ্রসিদ্ধ মনোমোহন নামক গ্রাম্য কবির একটা সঙ্গীত।

শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার—ছন্দের মায়া। বিচিত্রা, জ্যৈষ্ঠ '৪৩, পৃঃ ৬৪৫-৬৪৮।

কাব্যের সহিত ছন্দের সম্বন্ধ আলোচনা ও এই প্রসঙ্গে প্রাচীন এবং বর্তমান বাংলা সাহিত্য হইতে উদাহরণ সংকলন।

শ্রীতারাপদ দাশ—নদীয়া জেলার কয়েকজন সময়রপস্বী সাধক। ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ '৪৩, পৃঃ ৯৭১-৯৭৮।

লালনর্সাইজীর শিষ্য হিরুসা ও পাঞ্জুসা রচিত কতকগুলি সঙ্গীতের সংকলন ও আলোচনা।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র—শ্রীগোরাঙ্গ ও লীলাকীর্তন। ভারতবর্ষ, বৈশাখ '৪৩, পৃঃ ৭১৭-৭২৪।

কীতনের ক্রমপরিণতি, গৌরচন্দ্রিকার ইতিহাস ও কীতনপ্রচারে চৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য—এই সকল বিষয়ের আলোচনা।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়—“ছাতনার রাজবংশ-পরিচয়” ও চণ্ডীদাস। প্রবাসী, আষাঢ় '৪৩, পৃঃ ৩৪১-৩৪৫।

কিঞ্চিদধিক শতবর্ষ পূর্বে কৃষ্ণসেন-রচিত 'ছাতনার রাজবংশ-পরিচয়' নামক সন্দর্ভের আলোচনা ও তাহা হইতে চণ্ডীদাসের সময় নির্ধারণ।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়—“চণ্ডীদাস-চরিত”। প্রবাসী, বৈশাখ '৪৩, পৃঃ ১৮-২৯; জ্যৈষ্ঠ '৪৩, পৃঃ ১৭৭-৮৪; আষাঢ় '৪৩, পৃঃ ৩৭৮-৮৪।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে উদয়সেন-রচিত চণ্ডীচরিতাশ্রুত নামক সংস্কৃত গ্রন্থের ঊনবিংশ শতাব্দীতে কৃষ্ণসেনকৃত বঙ্গানুবাদের সংস্করণ।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়—চণ্ডীদাসের দেশ ও কালের লিখিত প্রমাণ। প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ '৪৩, পৃ: ২৫২-৬।

ছাতনায় প্রাপ্ত চণ্ডীদাসের প্রসঙ্গ-সংবলিত কয়েকখানি পুথির পরিচয়।

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য—চলিত বাঙ্গালা ও তাহার বানান। ভারতবর্ষ, বৈশাখ '৪৩, পৃ: ৬৫৭-৬৬৬।

চলিত বাংলার বানান সমস্তার সমালোচনা।

শ্রীঅনিলবরণ রায়—বাঙ্গালা ভাষার অঙ্গ-সংস্কার। ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ '৪৩, পৃ: ৮৫৯-৬০।

উচ্চারণানুযায়ী বানান প্রবর্তন ও যুক্তাক্ষর বর্জনের প্রয়াসের অসম্পত্তি প্রতিপাদন।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—বাঙ্গালা ভাষার রূপসমস্তা। ভারতবর্ষ, বৈশাখ '৪৩, পৃ: ৭১০-৭১৬।

বাংলা ভাষার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা নাই—বিগত শতাব্দীর গন্তরচনার কতকগুলি নিদর্শনের সাহায্যে এই মত প্রতিপাদনের চেষ্টা।

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য—বাগর্থবিজ্ঞান। ভারতবর্ষ, আষাঢ় '৪৩, পৃ: ১-১১।

শব্দের অর্থপরিবর্তনের নিয়মাদি আলোচনা।

শ্রীশ্রীলানন্দ সূত্রবিহারদ—সিংহলে সংস্কৃতচর্চা। মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ '৪৩, পৃ: ২৭৬।

প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত সিংহলে সংস্কৃত আলোচনা ও সংস্কৃত গ্রন্থগ্রণ্যনের ইতিহাসের আভাস।

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার—শ্রীচৈতন্যের জীবনী আলোচনার তিনটি ধারা। উদ্বোধন, বৈশাখ '৪৩, পৃ: ৪৩০-২, জ্যৈষ্ঠ, পৃ: ৫০৯-১২, আষাঢ়, পৃ: ৫৭৯-৮৩।

চৈতন্যদেবের সম্বন্ধে প্রাচীন কাল হইতে যে সমস্ত আলোচনা বিভিন্ন ভাষায় হইয়াছে, তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

শ্রীইন্দুভূষণ সেন—মহাত্মা গঙ্গাধর কবিরাজ। প্রবর্তক, জ্যৈষ্ঠ '৪৩, পৃ: ১৮৫-৮৮।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী কবিরাজ গঙ্গাধরের জীবনবৃত্তান্ত ও রচিত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত দিগ্‌দর্শন।

শ্রীচাক্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙ্গালা সমালোচনা সাহিত্য। মাসিক বসুমতী, বৈশাখ '৪৩, পৃ: ৫৮-৬৪।

বাংলায় প্রকাশিত সমালোচনা সাহিত্যের দিগ্‌দর্শন।

শ্রীপ্রীতি গুপ্ত—রামায়ণের এক অধ্যায়। বিচিত্রা, বৈশাখ '৪৩, পৃ: ৪১৬-৪৪১।

কিঙ্কিকাণ্ডে সীতাবেষণপ্রসঙ্গে রামায়ণে যে প্রাকৃতিক বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়, তাহার বৈশিষ্ট্য আলোচনা।

শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—শব্দরত্নাবলী ও মুসাখা। ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ '৪৩, পৃ: ৯৩০-১।

শ্রীললিতাশ দাশ গুপ্ত-লিখিত চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত এতদ্বিষয়ক প্রবন্ধের আলোচনা।

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন—জিপ্সি-ভাষায় ভারতীয় প্রভাব। বঙ্গপ্রীতি, জ্যৈষ্ঠ '৪৩, পৃ: ৬৩৫-৮।

পশ্চিম-জার্মানীর জিপ্সিদের কথাভাষার অভিধান হইতে ভারতীয় ভাষার শব্দের সহিত ধ্বনিসাম্য-বিশিষ্ট কতগুলি শব্দের সংকলন।

ইতিহাস

প্রবন্ধ

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী—কৈবর্তরাজ দিব্য । ভারতবর্ষ '৪৩, পৃ: ৩২-৪১ ।

দিবোর রাজপদে নির্বাচন সম্বন্ধে যে সাধারণ ধারণা আছে, 'রামচরিত' গ্রন্থের মূল ও অনুবাদ সাহায্যে তাহার নিরসন ।

শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী—পাণ্ডুনগর । ভারতবর্ষ, বৈশাখ '৪৩, পৃ: ৭৯২-৫ ।

পাণ্ডুনগর বা হিন্দু আমলের পাণ্ডয়ার স্থিতিনিদর্শনসমূহের পরিচয় ।

শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী—বৈদিকযুগের শিক্ষাপদ্ধতি । ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ '৪৩, পৃ: ২৫৫-৮ ।

বৈদিক সাহিত্যে ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে যে সমস্ত উক্তি আছে, তাহাদের আলোচনা ।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কলিকাতার বাঙালী সমাজ । প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ '৪৩, পৃ: ১৫৯-১৬৬, আষাঢ় '৪৩, পৃ: ৩১৮-৩৩১ ।

প্রথম বাঙালী সংবাদপত্রসেবী ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত 'কলিকাতা কমলালয়' ও 'সমাচার দর্পণ' নামক প্রাচীন সংবাদপত্র অবলম্বনে কলিকাতার বাঙালীসমাজের চিত্র প্রদর্শন ।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ—আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে কতিপয় বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষ । প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ '৪৩, পৃ: ২২৬-৩৩ ।

সারনাথ, কোশাধী, প্রাবস্তী, সাক্তে, পাবা ও কুশীদারার প্রাচীন ইতিহাস ও বৌদ্ধ নিদর্শনের আলোচনা ।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—পাশ্চাত্যমতে বেদের আলোচনা । ভারতবর্ষ, বৈশাখ '৪৩, পৃ: ৬৮৫-৯১ ।

উইনটারনিটজ প্রণীত History of Sanskrit Literature গ্রন্থে নিবন্ধ বেদবিষয়ক কয়েকটি উক্তির প্রতিবাদ ।

আবদুল মওজুদ—শাহজাহানের সিংহাসন লইয়া বিবাদ । মাসিক মোহাম্মদী, বৈশাখ '৪৩, পৃ: ৪৪৫-৯, আষাঢ় '৪৩, পৃ: ৬০৫-৭ ।

বিভিন্ন গ্রন্থ অবলম্বনে বিবাদের রিফুত বিবরণ ।

শ্রীঅদ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গে মাংসভক্ষ্য । প্রবাসী, আষাঢ় '৪৩, পৃ: ৩৬২-৩৬৯ ।

পাহাড়পুর ও মহাস্থান গড়ে খননের ফলে প্রাচীন স্তরে প্রাপ্ত গুপ্তযুগের ধ্বংসাবশেষ, অন্ততঃ বর্ণিত মাংসভক্ষ্যের বাথার্থ্য প্রমাণিত করে, ইহাই এই প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে ।

শ্রীপাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়—পিণ্ডারিদিগের বিবরণ । বঙ্গপ্রবী, জ্যৈষ্ঠ '৪৩, পৃ: ৭০৬-৮ ।

১৮১৮—২০ খৃষ্টাব্দের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত পিণ্ডারিদিগের বিবরণ-সংকলন ।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ—“দীন-ই-ইলাহী” । মাসিক বঙ্গমতী, বৈশাখ '৪৩, পৃ: ৩৯-৪৩ ।

আকবর কর্তৃক বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয়ে গঠিত 'দীন-ই-ইলাহী' নামক নূতন ধর্মের মর্ম, উদ্দেশ্য ও বিধানাদির আলোচনা ।

দর্শন

প্রবন্ধ

শ্রীক্ষেত্রমোহন বসু—প্রজ্ঞানের প্রগতি । ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ '৪৩, পৃ: ৮৩৩-৪১ ।

জাগতিক বস্তুত্ব সম্বন্ধে মানবের চিন্তাধারার ক্রমপরিণতির পরিচয় ।

শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়—কৃষ্ণলীলায় কামায়ন । বিচিত্রা, জ্যৈষ্ঠ '৪৩, পৃ: ৬১১-৬১৪ ।

কৃষ্ণলীলাবর্ণনায় শৃঙ্গারসের প্রভাবের আধ্যাত্মিক রহস্য নিদেশ ।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ—ঋষি চুয়াংজুর জীবনী ও বাণী । উদ্বোধন, বৈশাখ '৪৩,

পৃ: ৪৩৬-৪১ ।

চীনের তাও ধর্ম মতের ব্যাখ্যাতা চুয়াংজুর জীবনবৃত্তান্ত ও উপদেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ।

বিজ্ঞান

গ্রন্থ

গণিতপরিভাষা । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কতৃক প্রকাশিত । মূল্য চারি আনা ।

পূর্বপ্রকাশিত ও পরিষৎ-পত্রিকার বর্তমান বর্ষের প্রথম সংখ্যার সাহিত্য-বার্তায় উল্লিখিত পুস্তিকার সংশোধিত সংস্করণ ।

প্রবন্ধ

শ্রীনির্মলচন্দ্র লাহিড়ী—ভাবনির্ণয়ে বিভিন্ন মত । ভারতবর্ষ, আষাঢ় '৪৩, পৃ: ৯৩-৯৮ ।

ফলিতজ্যোতিষের ভাবনির্ণয়বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিভিন্ন মতের গুণাগুণ আলোচনা ।

শ্রীনীলরতন কর—শক্তির রূপান্তর । মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ '৪৩, পৃ: ৮৩১-৮৩৭ ।

বর্তমান জগতে প্রাকৃতিক শক্তিকে কার্যাকরী করিয়া তুলিবার চেষ্টার ইতিহাস ।

শ্রীজ্যোৎস্নাশঙ্কর ভাট্টা—গ্রীণ্ মতবাদে ভূপৃষ্ঠপরিকল্পনা । বিচিত্রা, বৈশাখ '৪৩,

পৃ: ৪৯৩-৪৯৯ ।

ভূপৃষ্ঠের জল ও স্থলভাগ সংস্থানের বৈচিত্র্য নিদে শাস্ত্রিক মতবাদের আলোচনা ।

শ্রীফণিভূষণ দত্ত—ভারতীয় গণিতে 'পাই' । ভারতবর্ষ, বৈশাখ '৪৩, পৃ: ৬৭৫-৬৭৯ ।

'পাই' বা বৃত্তের পরিধির সহিত ব্যাসের আনুপাতিক সম্বন্ধ বিষয়ে ভারতীয় গণিতগ্রন্থের গণনার পরিচয় ।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ—দিল্লীর প্রাচীন মানমন্দির । প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ '৪৩, পৃ: ১৮৫-৯১ ।

অম্বরাধিপতি জয়সিংহ-প্রতিষ্ঠিত মানমন্দির ও তাহার যন্ত্রাদির পরিচয় ।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—বৈজ্ঞানিক পরিভাষা । প্রবাসী, বৈশাখ '৪৩, পৃ: ১২৪-৩০, জ্যৈষ্ঠ '৪৩, পৃ: ২৬৬-৭২ ।

কলিকাতাবিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত 'গণিত' পরিভাষার বিস্তৃত আলোচনা ।

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার—ব্যাকটরিয়া । প্রকৃতি, ১২।৪৪২-৪৫৮ ।

বিভিন্ন রোগের মূল কারণ ব্যাকটেরিয়ার আকৃতি, প্রকৃতি ও প্রতীকার সম্বন্ধে আলোচনা ।

শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তী—সংখ্যালেখন-প্রণালী । প্রকৃতি, ১২।৪৯২-৯৭ ।

প্রাচীন কালে বিভিন্ন দেশের সংখ্যালেখন প্রণালীর ইঙ্গিত ।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

(প্রবন্ধের সত্যমতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

১। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনাকাল—	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যধরত	...	১৩৯
২। শাহ মোহাম্মদ সগীর—	ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক এম্ এ, পি-এচ ডি	...	১৪২
৩। মহাভারতে স্থানীয়মানতত্ত্ব—	ডক্টর শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত ডি এসসি	...	১৬১
৪। বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত			
প্রথম বাংলা অভিধান—	শ্রীসজনীকান্ত দাস	...	১৬৩
৫। দ্বিজ রামচন্দ্র বা কবিকেশরী			
রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার—	শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১৭১
৬। 'বঙ্গভাষায় রচিত প্রথম			
ইংরাজী ব্যাকরণ' (আলোচনা)	ঐ ঐ	...	১৮৪
৭। সাহিত্য-বাস্তবী—	পত্রিকাধ্যক্ষ		১৮৬
৮। ভ্রম সংশোধন		...	১৯০

এডওয়ার্ডস্ টনিক

ম্যালেরিয়া আদি

জ্বররোগে অব্যর্থ

বটিকম্প পান এণ্ড কোং লিঃ
ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিস্টস্
কলিকাতা।

পরিষদ গ্রন্থাবলী .

সংবাদপত্রে সেকালের কথা

প্রথম খণ্ড—দ্বিতীয় সংস্করণ (বহুস্থ)

চারি বৎসরের মধ্যেই এই গ্রন্থ নিঃশেষিত হইয়া যাওয়ায় ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। এই সংস্করণে গ্রন্থ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বহু নূতন বিষয়, টীকা-টিপ্সনী ও সেকালের সামাজিক চিত্র সংযোজন করিয়া গ্রন্থখানি সর্বদুঃস্থান করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। শীঘ্রই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

The learned editor has once again taken the trouble of going through the old Ms. and found occasion to correct the readings of the first edition in several cases. He has also revised the notes which have occasionally been improved by the insertion of fresh materials. The word-index has also been made thoroughly complete.—*Modern Review*, Aug. 1936.

চণ্ডীদাস পদাবলী

Scholars will be grateful to them [the editors] for giving the readings of numerous extant texts in critical foot-notes. The book satisfies modern scientific requirements. This edition will be a great contribution to the better knowledge and appreciation of Bengali poets and devotees.—*The New Review*, Jan. 1937.

The hard labour undertaken by them [the editors] in collating various Mss. deposited in different corners of the country and selecting variants—which are numerous.....has few parallels in the history of the publications of old vernacular texts.— *Modern Review*, Aug 1936.

শ্রীশ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী—

The edition.....has been enriched by a thorough overhauling of the account of authors which has been made up-to-date by the introduction of information brought to light by various scholars on different occasions since the publication of the first edition. *Modern Review*, Aug. 1936.

সংস্কৃত পুথির বিবরণ

তালিকাখানি পরিষৎ সংগ্রহ সঞ্চকীয় বিবিধ জাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ।.....বর্তমান গ্রন্থ প্রকাশে পরিষদের একটি বিশেষ অভাব পূর্ণ হইল। যে সমস্ত রত্ন লোকচক্ষুর অন্তরালে লুক্কায়িত ছিল এই তালিকা-গ্রন্থ তাহা প্রচারের বিশেষ সহায়তা করিবে।—প্রবর্তক, ভাদ্র, ১৩৪৩।

.....I have.....found it highly interesting—*Mahamahopadhyaya Gopinath Kaviraj M A, Principal, Benares Sanskrit College.*

দক্ষিণাঙ্গনের বাংলার রূপকথা

ঠাকুরমার ঝুলি

উদারাগের মত উজ্জ্বল নূতন রাজসংস্করণ—দেড় টাকা

শ্রীকালিদাস নান্ন কনিশেখর প্রণীত

গীতা-লহরী

গীতার এমন সরল, ছন্দোবৈচিত্র্যময় অপূর্ব বঙ্গানুবাদ কি পড়িয়া দেখিবেন না? মূল্য বার আনা
শ্রীতনুভূতি নান্ন সঙ্কলিত সচিত্র গল্পের বই

কথিকা

ভক্তমাল, বৌদ্ধজাতক, পঞ্চতন্ত্র, ঈশপের নীতি-কাহিনী, প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য, পুরাণ, বৈদিক
সাহিত্য, রাজতরঙ্গিনী, কথাসরিৎসাগর, রাজস্থান, বেতালপঞ্চবিংশতি ও নানাদেশের ইতিহাস
ইহাতে সংগৃহীত। মূল্য বার আনা

দি যোগেন্দ্র পান্নলিপিং হাউস

৩৮ নং ডি, এল, রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আয়ুর্বেদ
শাস্ত্রের
ঐতিহাসিক
নবযুগে

সি, কে, সেন এণ্ড কোং পুস্তক প্রচার বিভাগ

জাতীয় সাধনার একদিক উজ্জ্বল করিয়াছে।
জগতের যাবতীয় চিকিৎসা গ্রন্থের মূল ভিত্তিস্বরূপ মহাগ্রন্থ

চরক সংহিতা

আয়ুর্বেদ
প্রচারে
অগ্রদূত

চরক চতুরানন মহামতি চক্রপাণি-কৃত 'আয়ুর্বেদ-দীপিকা' ও মহামহো-
পাধ্যায় চিকিৎসক-বর গঙ্গাধর কবিরত্ন কবিরাজ মহোদয় প্রণীত 'জল্ল-কল্পতরু' নামী
উৎকৃষ্ট কাগজ ও মুদ্রণ দ্বারা সমগ্র সংহিতা গ্রন্থ সঙ্কলিত

প্রথম খণ্ডে সমগ্র স্বত্রস্থান, মূল্য ৭।০, ডাকমাণ্ডল ১।০

দ্বিতীয় খণ্ডে নিদান, বিমান, শারীর ও ইন্দ্রিয়াভিধানস্থান, মূল্য ৬।০, ডাকমাণ্ডল ১।০,

তৃতীয় খণ্ডে চিকিৎসা, কল্প ও সিদ্ধিস্থান, মূল্য ৮., ডাকমাণ্ডল ১।০

সমগ্র ৩ খণ্ড একত্রে ১৮. মাণ্ডলাদি স্বতন্ত্র।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং, লিমিটেড।

২২, কলুটোলা; কলিকাতা।

বিনয়কুমার সন্ন্যাসের বাংলা নই

১। একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র

প্রথম ভাগ :—নয়া সম্পদের আকার-প্রকার; ৪৪০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২।০।

দ্বিতীয় ভাগ :—বনবিজ্ঞানের নয়া-নয়া খুঁটী, ৭১০ পৃষ্ঠা, ৪৪টা ছবি, মূল্য ৪।০।

২। নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তন

প্রথম ভাগ :—জ্ঞানকাণ্ড, ৫৩০ পৃষ্ঠা, ১৫টা ছবি, মূল্য ২।০।

দ্বিতীয় ভাগ :—কর্মকাণ্ড, ৪৫০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২।০।

৩। বাড়তির পথে বাঙালী, ৬৩৬ পৃষ্ঠা, ৪৫টা ছবি, মূল্য ৩।০।

৪। স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ-নীতি (জার্মান গ্রন্থের তর্জমা), ২৩০ পৃষ্ঠা, ২।০।

৫। ধনদৌলতের রূপান্তর (ফরাসী গ্রন্থের তর্জমা), ৩১৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ১।০।

৬। পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র (জার্মান গ্রন্থের তর্জমা), ৩৪৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ২।০।

৭। হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন, ৩৮০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩।০।

৮। “বর্তমান জগৎ”—গ্রন্থাবলী (বার খণ্ডে, ৪৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ)

ষষ্ঠ খণ্ড,—বর্তমান যুগে চীন সাম্রাজ্য, ৪৫০ পৃষ্ঠা, ৫০টা ছবি, মূল্য ৩।০।

সপ্তম খণ্ড,—চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ, ১৫০ পৃষ্ঠা, মূল্য ১।০।

অষ্টম খণ্ড,—প্যারিসে দশ মাস, ৩১২ পৃষ্ঠা, মূল্য ২।০।

নবম খণ্ড,—পরাজিত জার্মানি, ৭০০ পৃষ্ঠা, ১৪৪টা ছবি, মূল্য ৬।০।

দশম খণ্ড,—সুইটসারল্যান্ড, ৭৫ পৃষ্ঠা, ৪টা ছবি, মূল্য ১।০।

একাদশ খণ্ড,—ইতালিতে বার কয়েক, ৩০২ পৃষ্ঠা, ৬টা ছবি, মূল্য ১।০।

দ্বাদশ খণ্ড,—ছনিয়ার আবহাওয়া, ২৮০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২।০।

বি সিংহ আগু কোং, ২০৯ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা।

প্রাচীন পবিত্র তীর্থ

গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে ৩শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির। ইহা একটি বহু পুরাতন সিদ্ধপীঠ এবং বলয়োপপীঠ নামে জনশ্রুতি আছে। এখানে পঞ্চমুণ্ডি আসন আছে। দেবতা সিদ্ধেশ্বরী, মহাকাল—ভৈরব। ই, আই, আর, হুগলী-কাটোয়া লাইনের জীরাট স্টেশনের প্রায় অর্দ্ধ মাইল পূর্বের মন্দির। এখানকার মাহুলীতে সন্তান হয় ও রোগ সারে। বিশেষ বিবরণের জন্তু রিপ্লাই কার্ড লিখুন।

বলাগড় পোঃ

সেবাইত—শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়।

কুঁচের তৈল

কেশরোগ-চিকিৎসক ডাঃ এন, সি, বসু এম বি আবিষ্কৃত ও বহু পরীক্ষিত টাক, কেশ-পতন, ইত্যাদি কেশ-রোগের এরূপ মহৌষধ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। মূল্য ২।০। তিন শিশি ২।০। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রামবাজার মার্কেট (দোতলা), কলিকাতা।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনাকাল

শ্রীযুক্ত স্নকুমার সেন তাঁহার সদ্য-প্রকাশিত ব্রজবুলীসাহিত্যের ইতিহাস (A History of Brajabuli Literature, Calcutta University, 1935) গ্রন্থের ৩৮৯ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, বিশেষজ্ঞদের মতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির লিপিকাল ১৫২৫ খ্রিঃ অঃ। তাহার পরেই লিখিয়াছেন, ভাষা সমধিক প্রাচীন হইলেও তন্মধ্যে এমন কিছু নাই, বাহাতে উহার রচনাকাল খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর শেষ পাদ অথবা পরবর্তী শতাব্দীর প্রথম পাদ নির্দেশ করিতে বাধে। এবং শেষে মন্তব্য করিয়াছেন, খুব নেকনজরে দেখিলেও বইখানাকে ১৫শ শতকের শেষার্ধ্বে পূর্বে লওয়া যায় না। তাঁহার যুক্তি,—(১) সনাতন গোস্বামীর বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণীতে চণ্ডীদাসের দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের উল্লেখ থাকিলেও উহা দ্বারা যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দান ও নৌকাখণ্ড লক্ষিত হইয়াছে, ইহা বলা সম্ভব নহে। পক্ষান্তরে গীতগোবিন্দের সহিত উল্লেখ চণ্ডীদাসও সংস্কৃত ভাষায় লিখিয়াছিলেন, এমনটাই বুঝায়। চণ্ডীদাস নামের পূর্বে শ্রী' সংযুক্ত থাকাতেও একটু আপত্তির কারণ হইয়াছে। কেন না, জীবিত ব্যক্তির নামের পূর্বেই সাধারণতঃ শ্রী' ব্যবহৃত হয়। তাহার অস্তিত্ব হইলেও সনাতন গোস্বামী যার-তার নামের আগে শ্রী' লিখিতে পারেন না। (২) মহাপ্রভুর প্রাচীন চরিত-গ্রন্থগুলিতে চণ্ডীদাস বা তাঁহার রচিত গ্রন্থের অনুলেখ। (৩) মুরারি গুপ্তের দান-লীলা ও নৌকা-লীলা, রূপ গোস্বামীর দানকলিকৌমুদী এবং কবি কর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয়োক্ত দান-বিনোদের সহিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দান ও নৌকাখণ্ডের বর্ণনাগত বৈষম্য।

(১) সনাতনের দৃষ্টিতে চণ্ডীদাস বড় ছিলেন না, কে বলিল? ঐ দান ও নৌকা-লীলাই যে কবিকে বড় করিয়াছিল। সংস্কৃত কবির সহিত ভাষা-কবির উল্লেখ দৃষ্টিকটু হইলে কৃষ্ণদাস কবিরাজই বা তাহা কেমন করিয়া করেন? এবং তাদৃশ দৃষ্টান্তও একান্ত হ্রস্ব নহে।

বিদ্যাপতিচণ্ডীদাসো জয়দেব-কবীশ্বরঃ।

লীলা-শুভঃ প্রেমযুক্তো রামানন্দ্য নন্দনঃ।

শ্রীগোবিন্দকবীন্দ্রোহিতঃ সিদ্ধঃ কৃষ্ণঃ কবীন্দ্রকঃ।

পুথিবাৎ ধন্যধন্যন্তে বর্জন্তে সিদ্ধ-রূপিণঃ।

(২) এখন দেখা যাউক, প্রাচীন কবিদিগের মধ্যে কে কে চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কাব্যের উল্লেখ বা ইঙ্গিত করিয়াছেন।

(ক) জয়ানন্দ মহাপ্রভুর প্রাচীন চরিতকারদের অত্যন্তম এবং তাঁহার চৈতন্যমঙ্গল (১৫৫৮-১৫৭০ খ্রিঃ অঃ) প্রামাণিকও বটে। তিনি লিখিয়াছেন,—

জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস।

শ্রীকৃষ্ণচরিত্র তারা করিল প্রকাশ।

(খ) স্পষ্টতঃ না বলিলেও বৃন্দাবনদাস তাঁহার চৈতন্যভাগবতে (১৫৫৭ অথবা ১৫৭৩ খ্রীঃ অঃ) চণ্ডীদাসের দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের যেন ইঙ্গিত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় ।

দানখণ্ড গায়েন মাধবানন্দ ঘোষ ॥

প্রভুর আশ্রয় শ্রীমুকুন্দ মহাশয় ।

কীর্তন করেন প্রভু নৌকায় বিজয় ॥

(গ) তার পর কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতের (১৫৮১ খ্রীঃ অঃ) একাধিক স্থলে গীতগোবিন্দের সহিত বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের উল্লেখ করিয়াছেন ।

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি

কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ ।

স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাতি দিনে

গায় শুনে পরম আনন্দ ॥

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ ।

এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ ॥

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ ।

ভাবামুরূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ ॥

(ঘ) নিত্যানন্দদাস তৎ প্রণীত প্রেমবিলাসে (১৬০০ খ্রীঃ অঃ) লিখিয়াছেন,—

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলাগানে ।

যে শুনে হয়রে তার মন আর প্রাণে ॥

সন্তোষ গোবিন্দ গোকুল সব গায় গীত ।

চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলায় হরে সবার চিত্ত ॥

সুকুমার বাবু এই চণ্ডীদাসকে নরোত্তম-শিষ্য মনে করেন । কিন্তু বিদ্যাপতির সহিত একত্র উল্লেখ থাকায় সম্ভবতঃ ইনি বড়ু চণ্ডীদাস । উদ্ধৃত বাক্যসমূহের লক্ষ্য যে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বাদনা-বর্জিত হইয়া বিচার করিলে তাহা বেশ বুঝা যায় । মহাপ্রভুর প্রাচীন চরিতাখ্যায়কগণের মধ্যে আর কেহ চণ্ডীদাসের প্রসঙ্গ করেন নাই, এই হেতুবাদে কৃষ্ণদাসের উক্তি অগ্রাহ্য হইবে, এ কেমন যুক্তি ? একই বিষয় বা ঘটনার বর্ণনা যে সকলকেই করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই ।

(৩) মুরারি গুপ্তের চৈতন্যচরিতামৃতে দান-লীলা ও নৌকা-লীলা যথাক্রমে গোবর্দ্ধন-আশ্রমে এবং মানস গঙ্গায় সংঘটিত হয় । দানকলিকামুদীর দান-লীলাও গোবর্দ্ধনপার্শ্বে অনুষ্ঠিত হয় । কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দান-লীলা মথুরার পথে বা অন্তর্য এবং নৌকা-লীলা যমুনায়া সম্পন্ন হয় । এই অনৈক্য দেখিয়া সুকুমার বাবু বলিতে চান, সনাতন গোস্বামীর উদ্দিষ্ট চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকার হইলে রূপ গোস্বামী দান-লীলা কখনই অপবিত্র ঘটাইতেন না । উক্তরে বলা যাইতে পারে, লীলায় বর্ণনা ইতিহাস পর্যায়ে নহে । প্রাচীন পুরাণ, এমন কি, ইতিহাসের মধ্যেও ত যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয় । আর রূপ গোস্বামী তাঁহার পদ্যাবলীতে যমুনায়া নৌকা-বিলাসের কবিতাই বা উদ্ধার করেন কেমন করিয়া ? খোঁজ করিলে যমুনায়া নৌকা-বিলাসের বিবরণ বিস্তর পাওয়া যাইবে । সুকুমার বাবুর আর এক যুক্তি, বৃন্দাবন ও মথুরা যমুনায়া একই পারে ;

কাজেই নৌকা-লীলা যমুনায় হয় না। অধুনা বৃন্দাবন ও মথুরা যমুনার এক তীরেই বটে; কিন্তু সে কালে বৃন্দাবন ও মথুরার মধ্যে যমুনা প্রবাহিত হইত। [এ বিষয়ে ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, ৬নন্দলাল দে বিরচিত ভারতের প্রাচীন ভৌগোলিক অভিধানাদি দ্রষ্টব্য।]

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনা-কাল সম্বন্ধে স্ক্রুমার বাবুর যুক্তি-পরম্পরা অত্যন্ত দুর্বল বলিতে হয়।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়

শাহ মোহাম্মদ সগীর*

(পঞ্চদশ শতাব্দী)

প্রাচীনতম মুসলমান কবিদিগের মধ্যে শাহ মোহাম্মদ সগীর অন্যতম। তদ্রূপিত “মুহুফ জোলেখা” নামক একখানি চমৎকার কাব্যগ্রন্থই তাঁহাকে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে অমর করিয়া রাখিবে। এই গ্রন্থের ১০৯৪ মবী অর্থাৎ (১০৯৪ + ৬৩৮) ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দের একখানি প্রতিলিপি এবং পরবর্তী আরও কয়েকখানি প্রতিলিপি আমাদের নিকট সংগৃহীত আছে।

ইহা একখানি বিরাট গ্রন্থ। প্রাচীন কালে খুব বেশীদৃশ্যক কবি এত বড় বিরাট কাব্য রচনা করেন নাই। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, এত বড় বিরাট গ্রন্থে কবি তাঁহার কোন পরিচয় দেওয়ার আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন নাই; এমন কি, সমগ্র কাব্যে মাত্র কয়েকটি ভণিতার ব্যবহার করিয়াছেন। আবশ্যক ভণিতাগুলি এইরূপ,—

১
“কহে সাহা মোহাম্মদ

ইছুম জলিখা পদ

দেসি ভাঙ্গা পয়ার বচি।”

২

“ইছুম জলিখা কিছা কিতাব প্রমাণ।

দেসি ভাঙ্গা মোহাম্মদ ছগিরিএ ভাণ।”

৩

“মোহাম্মদ ছগিরি দাসের দাস তান।

তাঁহা হোস্তু বড় ভাঙ্গা মোর নাহি আন ॥”

এই ভণিতাগুলি পাঠ করিলে দেখা যায়, কবির প্রকৃত নাম “শাহ মোহাম্মদ সগীর।” কবি সম্বন্ধে ইত্যধিক আর কোন সংবাদ জানিবার উপায় নাই। তবে তাঁহার “শাহ” উপাধি দেখিলে মনে হয়, তিনি কোন সাধকবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

“মুহুফ জোলেখা” কাব্যের ভাষা খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর “শ্রীকৃষ্ণকীর্তন” এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদে (১৪৮০ খ্রীঃ) রচিত “শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের” মধ্যবর্তী ভাষা। প্রাচীন পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, “শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়” ও তৎপরবর্তী “পরাগলী মহাভারতের” ভাষায় কোন বিশেষ প্রভেদ নাই। অথচ “শ্রীকৃষ্ণবিজয়” এবং “শ্রীকৃষ্ণকীর্তন”র ভাষায় আকাশ পাতাল প্রভেদ। “শ্রীকৃষ্ণকীর্তন” ও “মুহুফ জোলেখা”র ভাষায়ও প্রভেদ বিস্তর; কিন্তু “শ্রীকৃষ্ণকীর্তন” ও “শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের” ভাষায় যত প্রভেদ, তত নহে। অপিচ “মুহুফ জোলেখা”র ভাষা অনেক বিষয়ে “শ্রীকৃষ্ণকীর্তন” ও “শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের” ভাষার মধ্যবর্তী হারানো সূত্রকে ধরাইয়া দেয়।

এ সকল বাদানুবাদ না করিয়া, আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, কবি শাহ মোহাম্মদ সগীরের ভাষা, কবি জৈলুদ্দিন বা তৎসমসাময়িক মালাধর বস্তুর ভাষা হইতে প্রাচীন। এই প্রাচীনত্বের দাবীর প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষ প্রাধান্যযোগ্য,—

১। কবি সগীরের ভাষার যে সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, তাহা প্রাকৃত-ভাবাপন্ন শব্দের বহুল প্রয়োগ। যথা,—

“তোলা জখ সখি আছে নোআলি জৌবন।

ভাসব পাঠাই দেখ জাউ বন্দাবন ॥

ইছুকে বোলহ জাউক নিধুবনে।

তুলিয়া আনোক পুষ্প তোমার কারণে ॥

আমাতা কুমারি জখ রাগে কামাতুর।

লাস বেস করি জাউ বন্দাবনপুর ॥

জথেক নাগরিণা কামাকুল রাগে।

ইছুম ভোলাউ গিয়া যুক্তি আলাপে ॥”

“হেন মত ইছুম জলিখা নিবাসন্ত।

জলিখার কি ভাব ইছুম ন জানন্ত ॥

ইছুম জানন্ত মোখে গৌরব করন্ত।

বহুল আদর করে এহি অহুবন্ধ ॥”

আলোচ্য কাব্যে ব্যবহৃত প্রাচীন ভাবাপন্ন কতকগুলি শব্দের নমুনা দিলাম।—

- নোআলি জৌবন (নব যৌবন); গারুরি (বিষবৈদ্য); হাকলি-বিকলি (অস্থিরতা, চঞ্চল্য); উয়ারি (দালান, পুরী); ওসমিস (মেলামেশা, সম্ভাব); আওরে (আড়ালে); আওর (এবং); খেরি (ক্রীড়া); কটোরা (বাটি বা পাত্র); ডাকোয়াল (আহ্বানকারী, বোধগ্যকারী); অন্ধক (অঁধা লোক); লড়ি (লাঠি); অখাস্তর (অবস্থাস্তর); উশ্চা, উশ্ছা (উৎসাহ); গরুরা, গুরুরা (গুরু বা ভারী); উপস্কার কৈলা (মুছাইয়া দিলেন); উজাগর (ভোর, কাটাইয়া দেওয়া); বামর বদন (রক্ষ-শুষ্ক); দির্ঘল (দীর্ঘ); মউলিত (মুকুলিত); বিখোলিত (স্থলিত); উফর-ফাফর (হতভম্ব, হতবুদ্ধি); উবার (উজ্জল); অকুমারি (কুমারী); বালি (বালিকা); বন্দাবন (বাগান, উদ্যান); যাটল (ক্ষয় হইল); আবহো (এবেও); গিউ (প্রিয়া); জিউ (জীবন); মাচা (সত্য); কতো (কবু); খাঁখাঁর (কলঙ্ক); পুত্রবাচ (পুত্রসম জ্ঞান করা); কমন (কেমন); আউল-বাউল (পাগলের স্থায় উস্কু-শুষ্ক অবস্থা); উভা (দাঁড়াইয়া থাকা); ভাগ (ভাগ্য); সাখি (সাক্ষী বা সাক্ষ্য) ইত্যাদি ইত্যাদি।

সম্ভবতঃ বিদ্যাপতির মৈথিল ভাষা বা প্রাকৃত ভাষার প্রভাবে কাব্যের প্রায় সর্বত্র “ব” বর্ণ নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে “খ” বর্ণে পরিণত হইয়াছে,—বিখ, নিমেখ, ঔখদ, পেখিলু, বিখধার, বরিখ, বরিখেক, পুরুখ। (দিঠ, তছুপরে, জনি, দেহা, নেহা, ছোহন প্রভৃতি শব্দও দ্রষ্টব্য)।

২। “যুসুফ জোলেখা” কাব্যের ব্যাকরণ এই কাব্যের প্রাচীনত্ব দাবীর পক্ষে একটি প্রধান কারণ। ইহার ব্যাকরণ প্রধানতঃ “শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের” অনুসারী, এবং যে স্থলে ইহা

“শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন” হইতে একটু পৃথক, তৎস্থলে ইহা “কৃষ্ণকীর্তন” ও তৎপরবর্তী যুগের মাঝামাঝি কালের রূপ বলিয়া অনুমান করা যায়। এই স্থলে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল,—

সন্ধি :—মনরঙ্গ, মনুদাস, কামতুর, করঘাত, বৃন্দক (বিন্দু+এক) প্রভৃতি।

কর্মকারকে :—রাজাক, নৃপতিক, দূতক, ভাইক প্রভৃতি সর্বত্র সমানভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে।

সর্বনাম,—উত্তম পুরুষ :—আমি, মুঞি, মোহোর, আক্ষাসব, আক্ষাক, আক্ষারে প্রভৃতি।

মধ্যম পুরুষ :—তুমি, তোমার, তুমিসব, তোমাক ইত্যাদি।

নামপুরুষে :—সে, সেহি, তাক, এহি, তান, কেহো, কোহ, কোন।

ক্রিয়াপদ, বর্তমান কাল,—

প্রথম পুরুষ :—(ক) প্রায় এক তৃতীয়াংশ শব্দের—

থাকৌ, দেখৌ, করৌ, মাগৌ, লাগৌ প্রভৃতি রূপ।

(খ) প্রায় দুই তৃতীয়াংশ শব্দের—

থাকো, ফিরো, করো প্রভৃতি রূপ।

নাম পুরুষে :—(ক) প্রায় এক তৃতীয়াংশ শব্দের—

কহন্তি, বোলন্তি, ধাবন্তি, জোগায়ন্তি প্রভৃতি রূপ।

(খ) প্রায় দুই তৃতীয়াংশ শব্দের—

নেহালন্ত, বাখানন্ত, জানন্ত, চাহন্ত প্রভৃতি রূপ।

(গ) আবার কোথাও কোথাও—

ধাবএ, রবএ, আছএ, পারিএ প্রভৃতি রূপ।

অনুজ্ঞা :—কৈয়ার (তুলঃ কৃষ্ণ-কীর্তন “কহিয়ার” অর্থ—কহ)

“পুন তুমি কৈয়ার বচন। মুর্ছিত হইলা কি কারণ।”

দিয়ার (তুলঃ কৃষ্ণ-কীর্তন “দিআর” অর্থ—দাও)

“দিয়ার আপনা নাম, বাস তুমি কোন গ্রাম।”

নাম পুরুষের অনুজ্ঞা :—

আছউক, জাউ, জাউক, আনৌক, ভোলাউ, দেখৌ, জানউ, আছউ, বোলাউ প্রভৃতি রূপ।

অতীত কালের উত্তম পুরুষের তিন প্রকার রূপ, যথা—

(১) দিলু, সমগিলু, কহিলু প্রভৃতি। (অল্পসংখ্যায়)

(২) দিলুগ, কহিলুগ, জানিলুগ প্রভৃতি। (অত্যল্পসংখ্যায়)

(৩) দিলু, কহিলু, জানিলু প্রভৃতি। (অধিকসংখ্যায়)

অতীত কালের নাম পুরুষের এক ও বহুবচনে—ভেটিলেস্ত, করিলেস্ত, দিলেস্ত প্রভৃতি রূপ।

কবি সঙ্গীর শুধু কাব্যের খাতিরে এই কাব্য রচনা করেন নাই। ইহার রচনার পশ্চাতে ধর্ম-প্রেরণা সুস্পষ্ট। “শাহ” উপাধিদারী অর্থাৎ সাধকবংশীয় কবির প্রাণে কাব্যের মধ্য দিয়া

ধর্ম-কাহিনীর প্রচার-প্রেরণা কিছুই অস্বাভাবিক নহে। বাঙ্গালা ভাষাভাষী মুসলমানদিগকে “দেসিভাষা”র সাহায্যে মুসলিম উপাখ্যান শুনান তাঁহার অত্যন্ত উদ্দেশ্য হইলেও কবি যে কাহিনী আমাদিগকে শুনাইয়াছেন, তাহাকে অনায়াসেই রসাত্মক ধর্ম-কাহিনী বলা যায়। এই বিষয় কবি অজ্ঞাত নছেন; তাঁহার কাহিনীর এই দুইটি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তিনি বেশ সচেতন। তাই দেখিতে পাই, কাব্যের প্রারম্ভে ভূমিকায় কবি আমাদিগকে জানাইতেছেন,—

“কহিব কিতাব চাহি সুধারসপুরি।

শুণহ ভকত জন শ্রুতিঘট ভরি।”

এই স্থলে ভক্তজনকে কবির সুধারসপূর্ণ কাহিনী শুনাইবার প্রস্তাব লক্ষণীয়। বলিতে কি, তিনি সত্যই আমাদিগকে এক অপূর্ব সুধারসপূর্ণ কাহিনী শুনাইয়াছেন। আর একটবার কাব্যের শেষে এই কথাও জানাইয়া দিয়াছেন,—

“পোখার বৃত্তান্ত জেবা চিত্ত দিয়া শুনে।

তাক কুপা করে বহু প্রভু নিরঞ্জে।

ইচ্ছক জলিখা জেবা মন দিয়া যুগে।

আদি আস্ত শুনিলে সে ভাব হএ মনে।

... ..

একটিতো যুগে জে এই সব পরস্তাব।

পুণ্য বাড়ি দুক্ষ হরে যসকুতি লাভ।”

কবি যাহাই বলুন, অধুনা কেহ এই বিরাট কাব্য পড়িয়া পুণ্য বাড়িবার, দুঃখ হরণ করিবার বা যশকীর্তি লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন কি না, জানি না; তবে এই কথা সত্য যে, পাঠক এখনও এই কাব্য পাঠ করিয়া ইহার “সুধারসে শ্রুতিঘট” ভরিতে পারিবেন। প্রধানতঃ এই ভরসায় আমরা কবি-বর্ণিত কাহিনীটুকুর যথাসম্ভব সৌন্দর্য্য রক্ষা করিয়া নিম্নে বর্ণনা করিলাম।

তৈমূস নামক কোন নরপতির কন্যা জোলেখা এক অপূর্ব সুন্দরী রাজকুমারী ছিলেন। তাঁহার অপরূপ লাভণ্যে সুর-নর মুগ্ধ ও বিস্মিত হইত। নিঃসন্তান রাজদম্পতি বহু দান-ধর্ম ও আরাধনা করিয়া জোলেখা সুন্দরীকে লাভ করিয়াছিলেন। যথাসময়ে রাজকুমারী বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তাঁহার হৃদয়ে প্রেমভাবের সঞ্চার হয়। এই সময়ে তিনি বৎসরে এক এক বার করিয়া তিন বার তাৎকালিক মিসরাধিপতি যুবকরাজ আজিজ-মিসিরকে স্বপ্নে দেখেন। এই স্বপ্নের পর জোলেখার অবস্থা যাহা হইল, তাহা তিনি স্বয়ং সংক্ষেপে সখীর নিকট বর্ণনা করিতেছেন,—

“প্রথম বরিষ সপ্ন দেখাইলা ছল।

বুদ্ধি শুদ্ধি প্রাণ মোর হরি নিল বল।

দ্বিতীয় সপ্নন দেখি জুতি হরি নিল।

ইঙ্গিত আকাশ মুঞি এক ন জানিল।

ত্রিতীয় সপ্নেত দিল জাতি পরিচয়।

আজিজ মিশ্রির নাম কহিল নিশ্চয়।”

তৃতীয় স্বপ্নের পর প্রেমোন্মাদিনী জোলেখা শান্তভাবে ধারণ করিলেন। তাঁহার ইঙ্গিত মত চতুর্দিকে সংবাদ প্রেরিত হইল যে, তিনি স্বয়ম্বর হইবেন। এই সংবাদে নানা দিগেশ হইতে দূতগণ বিবাহের “পদগাম” (প্রস্তাব) লইয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। জোলেখা একে একে সকলকে বিদায় দিলেন এবং স্বপ্নদৃষ্ট আজিজ-মিসরের দূত আসিয়া না পৌঁছায় নিতান্তই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। নরপতি তৈমূস যথাসময়ে আজিজ-মিসরের নিকট দূত পাঠাইয়া স্বীয় কন্যার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত তাঁহাকে জ্ঞাত করাইলেন, এবং নিজেই সাধিয়া জোলেখার সহিত তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। আজিজ-মিসর সানন্দে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যাপারে গোলযোগ বাধিবার ভয়ে বিবাহের জন্ত তৈমূস রাজার রাজ্যে গমন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব বলিয়া সংবাদ দিলেন। অধিকন্তু তিনি স্বীয় দূতের দ্বারা তৈমূস-রাজের নিকট অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি যেন দয়া করিয়া জোলেখাকে মিসরে বিবাহের জন্ত প্রেরণ করেন। তৈমূস অগত্যা এই অনুরোধ রক্ষা করিলেন।

যথাসময়ে রাজা তৈমূস স্বীয় কন্যা জোলেখাকে মিসরে মহাসমারোহে বিবাহের জন্ত প্রেরণ করিলেন। জোলেখা মিসরে উপস্থিত হইলে, আজিজ-মিসর তাবী পত্নীক অভ্যর্থনা করিবার জন্ত মহাধুমধামে অগ্রসর হইলেন। যথোচিত অভ্যর্থনা করা হইলে উভয় দল রাজধানী অভিমুখে চলিল। এই সময়ে প্রেমাতুরা জোলেখা স্বীয় হস্তিপৃষ্ঠ হইতে জনতা-বেষ্টিত আজিজ-মিসরকে দেখিবার জন্ত স্বীয় বৃদ্ধা ধাত্রীর নিকট নিবেদন করেন। ধাত্রী হস্তিপৃষ্ঠের “কনক-রচিত আঁধারী” কাটিয়া একটি সুন্দর গবাক্ষ প্রস্তুত করিলেন এবং বলিলেন,—

“এহি গবাক্ষের পক্ষে দেখ পরভেক।

জেন মত আজিজের কাস্তি রূপ রেখ ॥

সেই রত্নপঙ্খ দিআ কৈল নিরক্ষণ।

মুশ্চিত পরিল দেখি হই অচেতন ॥”

জোলেখা চেতনা হারাইয়া বহু ক্ষণ পড়িয়া রহিলেন। ধাত্রী তাঁহাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন, কিছুতেই তাঁহার চৈতন্য হইল না দেখিয়া,—

“সখিগণে পুষ্পজল সিক্তে ধাক্কি সঙ্গে।

বিচ্ছিন্ন চামরে বাও করে কন্যা সঙ্গে ॥”

কিয়ৎক্ষণ পর জোলেখা সংজ্ঞা লাভ করিলে,—

“ধাক্কি আদি সখিগণে পুছিলেস্ত বাত।

কেহে হেন গতি কন্যা কহত আশ্রিত ॥”

এইরূপে সখীগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রেমাকুলা জোলেখা যে উত্তর দিলেন, তাহা বড়ই করুণ, বড়ই মর্শ্বদাহী। সখীদের প্রশ্নে তাঁহার হৃদয়ের যাবতীয় অবরুদ্ধ ব্যথা গুমরিয়া উঠিল, প্রেমবঞ্চিত ভরা-মৌবনের যাবতীয় স্মৃতি একে একে তাঁহার দক্ষ মর্শ্বপটে উজ্জল হইয়া ভাসিয়া উঠিল; তিনি ভুগভৃঙ্ছ অশ্রুদগারী আশ্রয় গিরির শ্রায় হৃদয়ের যাবতীয় সঞ্চিত বেদনা একটির পর একটি করিয়া উদগার করিতে লাগিলেন।—

রাগ কোরা—লয়িকা ছন্দ।

(লাচারি)

শুন শুন সখি,

জার তরে হইলু দুখি,

প্রাণের সখি ল।

প্রথম সপ্নেত দেখি হৃদয় অন্তরে কামহতা।

এ তিন বরিখ ধরি,

রজনী বসিআ ঝুরি

প্রাণের সখি ল।

বিরহ আনলে পুরি কাহাত কহিমু এহি কথা ? ৫ ॥

মোর হেন বিগরিত কাজ,

কলঙ্কিনি ভোবন সমাজ,

সে জন ন হএ এহি,

সপ্নেত দেখিলু জেহি,

প্রাণের সখি ল।

মোর তরে গেল কহি, সেই মোর পরমার্থ বাণি।

দোসর সপ্নের কথা,

কহিতে মরম বেথা,

প্রাণের সখি ল।

কহিল সে মোকে কথা,

ঝাকুল হইলু তথা, শুনিতে হইলু বুদ্ধি হানি।

চঞ্চল হইল মতি,

চপল হৃদএ গতি,

প্রাণের সখি ল।

প্রমাদ হইল অতি কথা পাইমু তাহান উদ্দেশ।

ত্রিতীয় সপ্নেত দেখি,

আঞ্চলে ধরিলু পেখি,

প্রাণের সখি ল।

প্রত্যক্ষ দেখিলু আখি চিত্তিতে হইল তমু সেস।

মুঞ্জে নারি কামরতা,

বিধি মোর বিড়ম্বিতা,

প্রাণের সখি ল।

আপনা রাখিমু কথা, পাসানে চাপিল কর মোর।

বিষয় হইল কাজ,

যাইমু কমন রাজ,

প্রাণের সখি ল।

কহিতে আপনা কাজ, ভাবিতে হইল মন ভোর।

কহিমু কেমন বুদ্ধি,

কেবা জানে তার শুদ্ধি,

প্রাণের সখি ল।

কথা পাইমু গুণনিধি, কে মোর করিব প্রতিকার।

কহে মোহাম্মদ সার,

বিরহ সমুদ্র পার,

প্রাণের সখি ল।

করহ উদ্দেশ তার, পির বিনে মনে নাহি আর।

জ্বোলেখা নীরব হইলেন। তাঁহার আবেগময় বিলাপে সকলের হৃদয়ে এক অপূর্ব কারুণ্যের ভাব উদ্ভূত হইল। “আম্বারী” মধ্যস্থ আনন্দকোলাহল মুহূর্তের মধ্যে থামিয়া গেল। জ্বোলেখা স্নানরী সহসা অন্তরীক্ষ হইতে এক “আকাশবাণী” শুনিতে পাইলেন,—

উঠ উঠ আএ কথা তাপিত হৃদএ।

তোম্মার মনের বাধা পুরিব নিশ্চএ ॥

আজিঞ্জ মিষ্টির তার নহে মনস্কাম।

শুকভোগ তার সঙ্গে হইবেক বাম ॥

আজিঞ্জ মিষ্টির তোর পতি মাত্র লেখা।

তার জ্বোগে হৈব তোর এতু মনে বেখা ॥

জেবা তুঙ্গি ভিত কর সদম তাহার ।
 স্থখ ভোগ তার সঙ্গে ন হৈব শৃঙ্গার ॥
 রতন মন্দির তোর বজের কপাট ।
 তার জুস্ত নহে মুক্ত করিতে সে বাট ॥

এইরূপ আকাশবাণী শুনিয়া, তাঁহার ভগ্ন হৃদয়ের কোণে অলস্কিতে একটি ক্ষীণ আশার
 • বিছাৎ রেখা খেলিয়া গেল। যত যুগ যুগান্তের পরেই হউক, একদিন বাঙ্কিতের সঙ্গে মিলিত
 হইবেন, এই আশ্বাসে তাঁহার প্রাণ চকিতে এক অপূর্ব আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহার এই
 মুক্তি দেখিয়া মনে হইল, “মৃত্যু-কায়া হোন্তে জেন আইল নিশ্বাস”। মিছিল পূর্ববৎ মহাসমারোহে
 চলিতেছিল। যথাসময়ে জোলেখা রাজপুরীতে উপস্থিত হইলেন।

রাজপুরীতে বিবাহের যথাবিধি আয়োজন হইয়াছিল। উভয়ে রাজপুরীতে পৌঁছিলে বিবাহ
 • সন্মপন্ন হইল। বিবাহান্তে যথারীতি “পুষ্পশয্যার” ব্যবস্থা হইল। কিন্তু হায়, বিধাতার বিধান
 এমনই যে,—“কত্থা সঙ্গে রাজার নাহি ওসুগিস্”। কেন না, সুপুরুষ আজিজ-মিসির জোলেখার
 নিকটবর্তী হইলেই রতিরসহীন হইয়া কাল যাপন করেন। ইহাতে জোলেখা আনন্দিতা হইলেন বটে,
 কিন্তু তাঁহার প্রেমাতুর হৃদয় উদ্দিষ্ট বাঙ্কিতের বিরহে নিয়ত দগ্ধ হইতে লাগিল। এই সময়ে তিনি
 কি ভাবে স্বামিরূপী শত্রুর পুরীতে বাস করিতেছিলেন, তাহার প্রতি শুধু মানস নয়নে, কল্পনার
 নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে পারা যায়। এই সময়ে পৃথিবীর যাবতীয় স্মৃতি-সামগ্রী এবং বিলাস-ব্যসনে
 মগ্ন থাকা সত্ত্বেও তিনি এক মুহূর্তের জন্তও শাস্তি লাভ করেন নাই। দাবানলসদৃশ বিরহ নিয়তই
 তাঁহার হৃদয়ে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল। বাঙ্কিতের সহিত মিলিত হইবার জন্ত তাঁহার প্রাণ
 পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর স্থায় সতত চঞ্চল অবস্থায় কাল যাপন করিতেছিল। এই বিশাল রাজপুরীতে
 সর্বদা সহস্র সহস্র দাসদাসী-পরিবৃত হইয়া থাকা সত্ত্বেও, তাঁহার অন্তরের বেদনা, মর্ম্মের দাহ,
 হৃদয়ের পীড়া নিবেদন করিবার স্থান ছিল না। তাই বাধ্য হইয়াই তিনি—

“গগনে তারক দেখি চাহে একমন ।
 তার সঙ্গে কাহিনি কহএ সর্বক্ষণ ॥
 তুঙ্গিসব ভ্রমিতে আছহ রাত্র দিন ।
 জোঙ্গা অবিদিত নাহি ভোবন এ তিন ॥
 ছুস্কের কাহিনি কহি গোঞাএ রজনি ।
 বিসেস ভাগিত মন বিরহ আগুনি ॥
 চান্দ ভেল মলিন বিরল তারাগণ ।
 অরুণ ওদএ হৈলে হএ আনমন ॥
 প্রভাতে পাখালে মুখ নয়নের জলে ।
 রুদ্ধিত বদন তান প্রতি উসাকালে ॥

এইরূপে • নীরবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া জোলেখা অসুন্দরী দিন কাটাইতে লাগিলেন। দিনের
 পর দিন, মাসের পর মাস অতিবাহিত হইতে লাগিল,—তাঁহার বেদনা-জর্জর প্রাণ কিছুতেই প্রবোধ

মানিল না। তাঁহার বাঞ্ছিত প্রিয়ের কোন উদ্দেশ্য তিনি লাভ করিলেন না। তাঁহার এই বিরহ-বিধুর চিত্র কবি মোহাম্মদ সগীর “বারমানীতে” অতি-নিপুণতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন।

এ দিকে জোলেখা সুন্দরী এইরূপ মর্মান্বাহী বিরহানলে জলিতে জলিতে অগ্নিদগ্ধ স্বর্ণের ঠায় শুদ্ধ এবং ধীরে ধীরে বাঞ্ছিত প্রিয়তমের প্রেমে মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। আর ঐ দিকে তাঁহার প্রিয়তম যুসুফও জোলেখার সহিত বিধি-নির্বন্ধ মিলনের জন্ত নানা ঘটনা-প্রবাহের মধ্য দিয়া নানা জীবন-বিপর্যয় অবলম্বনে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতেছিলেন। যুসুফের কবি-বর্ণিত জীবন-সূত্র ধরিয়া এইবার আমরা এ দিকে দৃষ্টিপাত করিব।

কোনান দেশে এয়াকুব নবীর আবির্ভাব হয়। ভগবানের ইচ্ছায় তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভে একে একে দশ জন বীর পুত্র জন্মগ্রহণ করে। যুসুফ তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত একাদশ পুত্র। কালক্রমে ইব্রাহীম আমীন নামে যুসুফের আরও এক ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। যুসুফ অনন্ত রূপ লইয়া জন্মিয়াছিলেন এবং সর্বকনিষ্ঠ বগিয়া পিতা তাঁহাকে নিতান্তই আদর করিতেন; এই জন্ত যুসুফের দশ ভ্রাতা তাঁহাকে অত্যন্ত হিংসা করিতেন। এই সময়ে—

“এক রাত্রি ইছুর আপনা বাসঘর।
অচেতন হই নিদ্রা জাএ ঘোরতর।
সযান্ত্রে-অলক্ষিতে দেখিলা মগন।
হেন অপক্লপ নাহি দেখে কোন জন।
একাদশ নৈক্ষত্র আগরে রবি মসি।
অষ্টাদশে প্রণাম করে ভূমিতলে পসি।
চৈতন্য পাইয়া সগ্ন বাপেত কহিলা।
সপ্নের বৃত্তান্ত জ্ঞাৎ সকল জানিলা।

এয়াকুব নবী কাহাকেও স্বপ্ন-বৃত্তান্ত জানাইতে যুসুফকে নিষেধ করিলেন। বিশেষতঃ তিনি যুসুফকে সাবধান করিয়া দিলেন যে, যেন তাঁহার দশ ভ্রাতা এই সমস্ত বিষয়ের কিছুই জানিতে না পারে। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, যুসুফ তাঁহার পর “নবী” হইবেন এবং তাঁহার বর্তমান দশ ও ভাবী এক, এই একাদশ ভ্রাতা কালক্রমে তাঁহার প্রাণাঞ্চল স্বীকার করিবে।

কিন্তু ভাগ্যচক্র এমনই যে, এই স্বপ্নের কথা যুসুফের ভ্রাতৃগণের অগোচর রহিল না। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাদের ভ্রাতার ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল। সুতরাং তাঁহারা যুসুফকে পিতৃসম্মিধান হইতে সরাইয়া বধ করিয়া ফেলিতে ষড়যন্ত্র করিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন যে, এইরূপেই নিষ্কণ্টক হইলে তাঁহারা পিতৃসম্মেহের পূর্ণ অধিকারী হইবেন। পরামর্শের পর স্থির হইল, যুসুফকে মৃগয়ার ছলে বনে নিয়া হত্যা করা হইবে এবং পিতার নিকট তাঁহাকে বাঘে খাইবার কথা প্রচার করিয়া ভ্রাতৃহত্যার দায় হইতে নিস্তার লাভ করা হইবে।

যথায়ুক্তি কাজ করা হইল। কপট মমতায় এয়াকুব নবীকে ভুলাইয়া, বালক যুসুফকে বনে নেওয়া হইল। বনে পৌঁছিয়াই ভ্রাতৃগণ অসহায় যুসুফকে হত্যার মানসে প্রহার করিতে

আরম্ভ করিল। সরলপ্রাণ বালক যুসুফের এই নিঃসহায় অবস্থা বড়ই করুণ, বড়ই হৃদয়-বিদারক। এই করুণ দৃশ্য দেখিলে মানুষের কথা দূরে থাকুক, পাখানের হৃদয়ও গলিয়া যায়। এই দৃশ্য অঙ্কন করিতে গিয়া কবি লিখিয়াছেন,—

“কোহু ভাই করঘাত অস্তে মারিল।
 কেহো দুষ্ট বাণি-বুলি কর্ণ মোচরিল।
 কেহো মারিলন্তু ঠেলা মারিয়া চাপর।
 একে একে কাড়ি লৈল গাএর কাপর।
 কেহো ভাই কোঙ্ক হই মারে অমুরাগে।
 আর ভাই নিকটে জায়ন্ত দয়াভাগে।
 সেহো ভাই ঠেলা দিয়া পেল এক পাস।
 আর ভাইকাছে গেল হইয়া হতাস।
 সেহো ভাই নিদয়া হৃদএ হৈয়া মারে।
 আর ভাই নিকটে জায়ন্ত বস্ত্র আড়ে।
 কোহু ভাই মায়' নাই সবে মারে বেড়ি।
 কান্দিতে লাগিল। তবে বাপ অমুখরি।”

এইরূপ নিশ্চমভাবে মারিতে মারিতে হঠাৎ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণে করুণার সঞ্চার হইল। তিনি সকলকে বলিলেন যে, আর এইরূপ নির্দয়ভাবে না মারিয়া, যুসুফকে এক অন্ধকূপে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করা হউক। রক্তাক্তকলেবর যুসুফকে সত্য সত্যই এক অন্ধকূপে নিক্ষেপ করা হইল এবং তাঁহার শোণিত-সিক্ত বস্ত্র লইয়া আসিয়া এয়াকুব নবীকে বুঝান হইল যে, যুসুফকে বাঁধে থাইয়াছে। কিন্তু এয়াকুব নবীর হৃদয় প্রবোধ মানিল না। তিনি প্রিয়তম পুত্রের নিধন-সংবাদে শোকে ও হুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং শোকাকুল হইয়া তিনি খেদ করিতে লাগিলেন,—

“মোর কর্ম দোস,	বিধি কৈল রোস,
কোন পাপ মোর বাধা।	
জাই ভিন্ন দেস,	ব্রহ্মগরি ভেস,
পুরিতে মনের সাধা।	
ঘরে ঘরে জাই,	পুল্ল যথা পাই,
পুল্ল হেন ভিক্ষা মাগৌ।	
কোন ধর্ম দিক্ষা,	পুত্র দিব ভিক্ষা,
তান পদগত লাগৌ।”	

কিছুতেই কিছু হইল না; এয়াকুব নবী পুত্রের কোন সংবাদ না পাইয়া বিধাদে দিন কাটাইতে লাগিলেন। কিন্তু বারংবার তাঁহার মনে হইত যে, তাঁহার প্রাণপ্রিয় যুসুফ যেন বাঁচিয়া আছেন। যুসুফ সত্য সত্যই কূপে পড়িয়াও জীবিত ছিলেন।

যুসুফকে কুপে নিক্ষেপ করার পরেই “মনিরু” নামক এক মিসরদেশীয় বণিকের নেতৃত্বে একদল বণিক ঐ বনপথে চলিতে চলিতে কুপ-সন্নিহিত কোন এক স্থানে বিশ্রাম করিতেছিল। এই সময়ে তাহাদের জলাভাব ঘটে। তাহারা জলের অন্বেষণে বাহির হইয়া, নিকটেই কুপ দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল এবং জলের জন্ত দড়ি বাঁধিয়া কুপে “কুস্ত” ফেলিয়া দিল। যুসুফ নীরবে কুস্তে উঠিয়া বসিলেন। “সাধুগণ” তাঁহাকে পাইয়া মনিরুর নিকট লইয়া গেল। সাধু মনিরু এই অপকৃপ বালকটিকে লাভ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন এবং বাণিজ্যযাত্রা বন্ধ করিয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের জন্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

ঠিক এই সময়ে যুসুফের দশ ভ্রাতা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা বণিকদলে যুসুফকে দেখিয়া আশ্চর্য্যাবিত হইল এবং মনিরুর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল,—“আমরা আমাদের দুই দাসকে কুপে ফেলিয়া দিয়া মরিয়া ফেলিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম, তোমরা যখন তাহাকে উঠাইয়া লইয়া যাইতেছ, তখন হয় তাহার মূল্য দাও, নয় তাহাকে ফেরৎ দাও।” ইহাতে—

“সাধু বোলে মোর ঠাকি ধন নাহি আর।

তোমার ঢেপুয়া লও এই মূল্য তার ॥”

মনিরু সাধু “তোমার ঢেপুয়া” দিয়া যুসুফকে কিনিয়া লইলেন এবং যথাসময়ে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মিসর দেশে পৌঁছিলেন। যেখানেই যুসুফকে লইয়া যাওয়া হইত, সেখানেই তাঁহার অলৌকিক রূপ-লাবণ্য দেখিবার জন্ত নানা স্থান হইত লোকজন ছুটিয়া আসিত। অচিরকাল মধ্যে যুসুফের সৌন্দর্য্যের কথা চতুর্দিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। মিসররাজ আজিজ-মিসির যুসুফের কথা জানিতে পারিলেন এবং তাঁহাকে রাজপুরীতে লইয়া আসিতে সাধুর নিকট খবর দিলেন।

রাজা আজিজ সাধু যুসুফকে লইয়া রাজপুরীতে উপস্থিত হইলেন। সকলে যুসুফকে দেখিবার জন্ত সমাগত হইল এবং সকলেই তাঁহাকে ক্রয় করিবার জন্ত ওৎসুক্য প্রকাশ করিতে লাগিল। সাধু সুযোগ বুঝিয়া প্রচার করিলেন যে, যুসুফের শরীরের সমভার মহামূল্য সামগ্রী এই ক্রীতদাসের মূল্য। এতৎসত্ত্বেও তাঁহাকে ক্রয় করিবার চেষ্টা চলিল। কিন্তু কেহই সফলকাম হইতেছিল না।

এই সময়ে জোলেখা তাঁহার প্রাত্যহিক নগর-ভ্রমণ হইতে উদ্ভারোহণে প্রত্যাবৃত্তা হইতেছিলেন। তিনি “গড়ের” অর্থাৎ রাজ-প্রাসাদের বহিঃপ্রাচীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া জনকোলাহল শুনিয়া সমস্ত বিষয় জানিতে পারিলেন এবং ক্রীতদাসকে স্বয়ং একবার দেখিবার জন্ত সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। যুসুফ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র তাঁহাকে অবিকল স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তিবৎ প্রতীয়মান হওয়ায়, জোলেখা ভাবাবেশে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। সংজ্ঞালাভ করিয়া তিনি সর্ব্বস্বের বিনিময়েও যুসুফকে ক্রয় করিতে প্রস্তুত হইলেন।

অতঃপর জোলেখা ও আজিজ-মিসির যুসুফকে ক্রয় করেন। এই সময়ে রাজাসুগ্রহে রাজপুত্রবৎ সুখ শান্তিতে যুসুফ রাজপুরীতে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। এই সময়ে জোলেখা উদ্ভিন্ন-যৌবনা যুবতীসুলভ নানা রঙ্গ-রস ও হান্ত-পরিহাসের মধ্য দিয়া দেব-চরিত্র যুসুফকে কামভাবে তৎপ্রতি প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু যুসুফ—

“জলিখার মনবাঞ্চা দেখে সমদৃষ্টে ।

ইচ্ছুক হেরএ হেট মাথা পদপিষ্টে ॥”

যুসুফের এহেন ঔদাসীন্ত নিরীক্ষণ করিয়া সুন্দরী জোলেখা স্বীয় বৃদ্ধা ধাত্রীকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন ; তিনি সবিস্তারে জোলেখার যাবতীয় বৃত্তান্ত তাঁহার পদে নিবেদন করেন। যুসুফ কিছুতেই স্বীয় পুণ্যপথ হইতে টালিলেন না, কিছুতেই দেব-চরিত্র হইতে ভ্রষ্ট হইলেন না। তিনি নিস্পৃহ মূর্তি ধারণ করিয়া বলিলেন,—

“বাপের গৌরবস্তরে হৈলু ভিন্নদেশ ।

জলিখার ভাবে মোর কি আছে বিশেষ ॥

পুত্রবাচ দিয়া মোরে পুত্রীর জিতর ।

সমর্পিল জলিখার হাতের উপর ॥

* * * *

কেহ যদি শুনে এহি দুরাচার বাণি ।

ভোবন ভরিআ হৈব অযস কাহিনি ॥

ধাত্রী বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাভর্তন করিল। জোলেখা সমস্ত অবগত হইয়া বুঝিতে পারিলেন যে, এই ভাবে যুসুফকে সৎপথভ্রষ্ট করা ছুরূহ কাজ ; সুতরাং অগ্র পথ অবলম্বন করা ব্যতীত উপায় নাই।

এইবার জোলেখা পুত্রীর বাহিরে এক সপ্তকক্ষ সুরম্য মন্দির নির্মাণ করাইলেন। ইহার নানা কক্ষে কামভাবোদ্দীপক নানা চিত্র ও বস্তুর সমাবেশ করা হইল। তাহা দেখিলে মানবের কথা দূরে থাক, দেবতার মনও টালিয়া যাইত। এই বিচিত্র মন্দিরে বাস করিবার জন্ত যুসুফকে প্রেরণ করা হইল। কিছু দিন পর একদা জোলেখা এই মন্দির পরিদর্শনে যাইবেন স্থির করিলেন। যথারীতি সাজসজ্জা আরম্ভ হইল। বর্তমান যুগে জোলেখার এই সাজসজ্জার বর্ণনা বেশ উপভোগ্য বস্তু, সন্দেহ নাই,—

“জলিখা করএ বেস,

চিকুর চামরি কেস,

বান্ধএ কানরি খোপা লাস ।

নানা কুহুখিত জুতি,

দেখি চমকিত মতি,

ঘন মৈন্ধে নৈক্ষত্র প্রকাশ ॥

নয়ন খঞ্জন তুল,

আঞ্জনে রঞ্জিত মূল,

চঞ্চল চকোর সমুদিত ।

নিমেষে নির্মল বাণ

কটাক্ষেত হৃদয়ান,

বিরহিনি পন সচকিত ॥

সিসেত সিন্দুর ভাসে,

জেন রবি পরকাসে,

মুখচন্দ্রজুতি সমুদিত ।

শ্রবণে গুহিত মূর্তি,

রতন কুণ্ডল জুতি,

তাঁরাপ্রভা জিনিয়া বিদিত ॥

গিমগত হিরা হার, রচিত সোবর্ণ সার,
গজমুতি বিরাজিত পাণ্ডি ।
তাহাত কুম্ভমালা, বিসেস সুভিত ভাল,
বিনি সূতে গাথে কত ভাতি ॥
কস্তুরি কুম্ভম বুল, কপালে তিসক চন্দ,
জেন চন্দ্র নৈক্ষত্র পুরিত ।
চন্দ্রে চর্চিত অঙ্গ, কেশর স্বগন্ধি সঙ্গ,
জিনি তনু কাশ্তি যুসোভিত ॥
কাঞ্চলি মণ্ডিত হার, সরচিত পায়োভার,
বসন ভূসন আভরণ ।
হুলাক্ষ লাবাণ্য বেস, মুহিত সকল দেশ,
উনমত্ত নবিন জৌবন ॥
করেত বঙ্কণ বর, জেন চন্দ্র দিগংকর,
কনক মাণিকা জুতি সার ।
নানা অলঙ্কার রঙ্গ, সোবর্ণ রঙন সঙ্গ,
রূপে সচি জেন অবতার ॥
বাছসেও তাড় ভারি সোবর্ণ ঊষল ধারি,
চুনি মণি বিচিত্র নির্দ্বার ।
অঙ্গুরি মাণিকা জরি, দশাজুলে ভরি পুরি,
বহুমূল্য ভোবন বিধান ॥
কটিও কিঙ্কিনি বাজে, জেন চন্দ্র যুব শাজে,
কি কহিয়ু তাহার বাধান ।
চরণে নপূর বাজে, কনক বরণ শাজে,
তার জুতি চমকে চরণ ॥

এইরূপ সাজসজ্জায় বিভূষিতা হইয়া সুন্দরী জোলেখা সপ্তকক্ষ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে সঙ্গে লইয়া, একে একে কক্ষের পর কক্ষ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে দুর্কার্যে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য শত প্রকারে সহস্র ভাবে প্রলুব্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। একটির পর একটি করিয়া যখন সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল, তখন জোলেখা যুদ্ধক্ষেত্রে পদে আসিয়া বিকাইয়া দিয়া বলিলেন,—

“মুখি বুক সজ্য তুমি জলন নিপুণ ।
বুলেক পড়িলে জল ন হৈবেক উপ ॥
জাচক তুলনা আশি তুমি দাতা জন ।
ভক্ষদান দিলে কতো ন টুটিব ধন ॥
তুমি বুধাধর আশি ত্রিষাএ বিকল ।
আশা অল্প দিলে তোহ্মা ন টুটিব জল ॥

তুষ্টি মোহা বহুতর ফলিত নির্মল ।
আত্মা এক বল দিলে ন হৈব নিফল ॥

... ..

কৃপিনের ধন জেন করএ সঞ্চিত ।
জাচক জনেরে কভো না কর বঞ্চিত ॥”

ইহাতে যুসুফ টলিলেন না । তিনি বার বার ভগবানের নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন ; বার বার ধর্মশাস্ত্রের কথা তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল । সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, তিনি চঞ্চল মূর্তি পরিহার করিলেন এবং প্রশান্ত মনে গভীরভাবে উত্তর দিলেন,—

“খেমা কর মোর তরে কিছু কর দয়া ।
অপকির্তি হৈব তোম্মা জগত ভরিয়া ॥

... ..

খুধা হৈলে বিভীক্ষ ভৈক্ষ নি দুই করে ।
ভিক্ষায় বহুল জল ন পিএ সত্তরে ॥
পাথরে চাপিলে কর করিবেক কল ।
জীবন গরবে কষ্টা না হৈঅ বিকল ॥”

যুসুফের এহেন অপ্রত্যাশিত উত্তর শুনিয়া, জোলেখা আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না । তিনি কামাতুর মনে যুসুফকে জড়াইয়া ধরিতে সচেষ্ট হইলেন । পাপভয়ে যুসুফ ছুটিয়া পলাইলেন । জোলেখা পলায়নপর যুসুফকে তাড়া করিলেন ; কিন্তু ধরিতে পারিলেন না । অবশেষে যুসুফ যখন বাহির হইতেছিলেন, তখন জোলেখা যুসুফের জামার পশ্চাদ্ভাগ ধরিয়া ফেলিলেন ; কিন্তু তিনি জামার কিয়দংশ জোলেখার হাতে রাখিয়া পলায়ন করিলেন । জোলেখার মাথায় বাজ পড়িল, তিনি শয্যায় লুটাইয়া পড়িলেন ।

ইহার পর জোলেখা যুসুফের নামে সতীত্ব নাশের অপবাদ রটাইয়া দিলেন । আজিজ-মিসরের হাতে যুসুফের বিচার হইল । আল্লার হুকুমে এক দুগ্ধপোষ্য শিশু সাক্ষ্য দিল । প্রমাণিত হইল যে, যুসুফের জামার পশ্চাদ্ভাগ যখন ছিল, তখন নিশ্চয় তিনি এই ব্যাপারে নির্দোষ । যুসুফ সাময়িকভাবে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন ।

এই ঘটনার পর একদা জোলেখা সখীদের সহিত যুসুফের অপরাধ রূপ-লাবণ্যের আলোচনা করিতেছিলেন । তাহারা যুসুফকে দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তাঁহাকে ডাকাইয়া আনা হইল । যুসুফ যখন সখীদের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন তাহারা নানা দ্রব্য ও ফলমূল আহর করিতেছিল ; তাহারা যুসুফকে দেখামাত্রই এমনই মুগ্ধা হইল যে,—

“হাতেত তরুণা ফল কাতি খরদান ।
হস্ত সমে ফল কাটে আন নাহি স্তান ॥
বুনিত পড়এ জেন ফলরসধার ।
কামভাবে নেহালন্ত মুখচন্দ্র তার ॥
কর হোস্তে অবিরত পড়এ বুনিত ।
তথাপিহো নারি সবে চাহে একচিত ॥”

যুসুফকে দর্শন করিয়া জোলেখার সখীদের যে শোচনীয় অবস্থা হইল, তাহা দেখিলে মনে হয়,—

“জেন এক অদ্বিপেত পতঙ্গ বহল ।
পড়িতে চাহএ মিঠা হইয়া আকুল ॥
জেন এক স্বধাতর ফলস্ত উঞ্চল ।
তলে থাকি সর্বজনে থাইতে চাহে ফল ॥
ধরিতে ন পারে ফল ন পড়এ হাতে ।
খুদাএ বিকল সরিরেত মর্শ্ববাতে ॥

ধীরে ধীরে জোলেখার সমস্ত কথা সাধারণ্যে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। জোলেখা অত্যন্ত লজ্জা অনুভব করিলেন এবং আজিজ-মিসিরকে অনুরোধ করিয়া যুসুফকে বন্দী করাইলেন। এইরূপে রমণীর চক্রান্তে যুসুফ বন্দীজীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

ইহার কিয়ৎকাল পরে আজিজ-মিসিরের মৃত্যু হইল। মিসরে এক নূতন রাজা সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি রাজা হইয়াই কোন অপরাধে ছুইটি লোককে কারাগারে প্রেরণ করিলেন। এই দুই কয়েদীর সহিত কারাগারে যুসুফের পরিচয় হইল। একদা এই দুই কয়েদী ছুইটি স্বপ্ন দেখিল। একজন দেখিল,—তাহার মস্তকস্থিত আহার্য্যপূর্ণ স্বর্ণখাল হইতে কাক ও চিল আহার্য্য সামগ্রী কাড়িয়া থাইতেছে। অপর ব্যক্তি দেখিল,—সে স্বর্ণের “কটোরা” লইয়া ভীতমনে রাজার সম্মুখে দণ্ডায়মান। কয়েদীদ্বয় এই স্বপ্ন দুইটির ব্যাখ্যার জন্য যুসুফের শরণাগত হইল। তিনি ব্যাখ্যা করিলেন যে, শীঘ্রই প্রথমোক্ত কয়েদীর শিরশ্ছেদ ও দ্বিতীয়োক্ত কয়েদীর রাজানুগ্রহ লাভ ঘটবে। ফলে তাহাই হইল এবং যুসুফের ব্যাখ্যার সত্যতা প্রতিপন্ন হইল।

অনন্তর মিসরের নবীন বাদশাহ এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখিলেন। ইহা কবির ভাষায় এইরূপ,—

সপ্ত বুধ হুট পুট অতি যুবলিত ।
আর সপ্ত বুস কুস তন্নু ছুর্কলিত ॥
খিনবল সপ্ত গরু বলবন্ত হৈয়া ।
এহি সপ্ত বৃসক থাইতে গেল ধাইয়া ॥
জেন ব্যাছে ঝাম্প দিয়া তাহাক ধরিল ।
অহি সপ্ত পুটতনু গরুক ভক্ষিল ॥
আর এক অপূর্ব দেখিল নুপবর ।
সপ্ত ছড়া গোহম (গোন্দম ?) গাছাইল তছু পর ॥
শুকবর্ণ সপ্ত ছড়া তেহেন যুরিত ।
জেহেন চামর দোলে অতি স্থললিত ॥
তাহার নিকট হোস্তে আর সপ্ত ছড়া ।
গাছাইল তেহেন বর্জিত জেন মরা ॥
সপ্ত ছড়া মরএ জলিল পূর্ণ ছড়া ।
সেই ক্ষণে যুখাইল জেন হই বরা ॥

এইরূপ বিচিত্র স্বপ্ন দেখিয়া রাজা পাত্রমিত্রকে ডাকাইয়া ইহার ব্যাখ্যা চাহিলেন। কেহই ঠিক ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হইল না। এই সময়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে রাজামুগ্ধ প্রাপ্ত পূর্বোল্লিখিত কয়েদীটি বাদশাহকে জানাইল যে, যুসুফ নামক যে কয়েদী আছে, সেই ব্যক্তি ব্যতীত কেহই ইহার সছতর দিতে পারিবে না। বাদশাহ যুসুফকে কারামুক্ত করিয়া মহাসমারোহে রাজদরবারে উপস্থিত করিলেন। যুসুফ সকলকে স্তম্ভিত করিয়া ব্যাখ্যা দিলেন যে, মিসরে উপযুপরি সাত বৎসর অত্যধিক শস্য জন্মিবে এবং তৎপর ক্রমান্বয়ে সাত বৎসর ধরিয়া অজন্মা হইবে। ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। রাজা যুসুফকে বলিলেন,—“যুসুফ, তুমি রাজকার্য্যের উপযুক্ত ব্যক্তি ; তোমাকে ‘আজিজ-মিসির’ (মিসরপ্রিণ্ড, প্রধান মন্ত্রী ?) করিলাম ; তুমি রাজ্যকে আসন্ন বিপদ হইতে মুক্ত করিবার ব্যবস্থা কর।” যুসুফ “আজিজ-মিসির”-পদে অধিষ্ঠিত হইয়াই সাত বৎসর ধাবৎ রাজ্যের স্থানে স্থানে রাজশস্তাগার স্থাপন করিয়া, তথায় সাত বৎসর যাবৎ শস্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মিসর-রাজ্যের মৃত্যু হয়। সকলে মিলিয়া যুসুফকে মিসরের সিংহাসন দান করেন। যুসুফ রাজা হইয়াই দেশে শ্বশাসনের প্রতিষ্ঠা করেন।

এ দিকে জোলেখা অত্যন্ত বৃদ্ধা হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু তখনও তিনি যুসুফকে ভুলিতে পারেন নাই। বহু বৎসর ধরিয়া মিসরের রাষ্ট্রবিপ্লবে তাঁহার বিশেষ ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, কিন্তু যুসুফকে তিনি কিছুতেই হৃদয় হইতে অপসারিত করিতে পারেন নাই। তিনি এখন ভিখারিণী ; কিন্তু তথাপি পথের ধারে বসিয়া যুসুফের বাতায়ত নিরীক্ষণ করেন, চির উপেক্ষিত হৃদয়কে প্রিয়তমের দর্শনে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু যুসুফের আদেশে রাজপ্রহরীরা কোন রমণীকে তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইতে দেয় না,—ইহাই জোলেখার অন্ততাপ।

এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল। একদা জোলেখা রাজপথের ধারে বসিয়া প্রহরীর সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া যুসুফের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। যুসুফ আদেশ দিলেন, এই বৃদ্ধা বাহা চায়, তাহা তাহাকে দান কর। আশ্চর্য্যের বিষয়, বৃদ্ধা যুসুফের দর্শন ব্যতীত আর কিছুই ভিক্ষা মাগিল না। তাঁহাকে রাজ-অন্তঃপুরে লইয়া যাইতে আদেশ দেওয়া হইল এবং যথাসময়ে যুসুফ বৃদ্ধাকে দর্শন দিলেন। এইখানেই যুসুফের সহিত জোলেখার নূতন করিয়া পরিচয় হয় এবং এখনও জোলেখা যৌবনের প্রেম পোষণ করিতেছেন দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইয়া যান। বলা বাহুল্য, যুসুফ এখন “নবী”। জোলেখা তাঁহার পূর্বযৌবন ভিক্ষা দিতে যুসুফকে অনুরোধ করেন। যুসুফের আশীর্ব্বাদে জোলেখা মুহূর্ত্তের মধ্যেই পূর্বযৌবন লাভ করিলে, তিনি যুসুফকে জানাইলেন যে, এখন তাঁহাদের বিবাহে আর কোন বাধা নাই। খোদার হুকুমে যুসুফ ও জোলেখার বিবাহ হইল।

বিবাহের পর জোলেখার গর্ভে একে একে যুসুফের দুই পুত্র জন্মে। এই সময়ে মিসরে সপ্তবর্ষব্যাপী ভূভিক্ষ আরম্ভ হয়। যুসুফের পিতৃরাজ্য কেমন প্রদেশেও এই সময়ে ভূভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছিল। মিসর ব্যতীত তখন আর কোথাও শস্য ছিল না। শস্য ক্রয়ের জন্য যুসুফের বিমাতার গর্ভজাত দশ ভ্রাতা এই সময়ে মিসরে আগমন করে। যুসুফ তাহাদিগকে চিনিয়া ফেলেন ও বিশেষ অনুরোধ প্রদর্শন করেন। তাহাদের মুখে যুসুফ জানিতে পারেন যে, তাঁহার পিতা এগারকুব নবী তখনও জীবিত এবং ইব্রু আমীন নামে তাহাদের এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা আছে। তিনি

ভ্রাতা ও পিতাকে দেখিবার জন্ত উদ্গ্রীব হইলেন। যুসুফ তাঁহার ভ্রাতৃগণকে বলিলেন যে, ইবনু আমীনকে সঙ্গে লইয়া আসিলে তিনি তাহাদিগকে আরও অনুগ্রহ করিবেন। তাঁহার ইঙ্গিত মত অপর ভ্রাতাদের সঙ্গে ইবনু আমীন শস্ত ক্রয় করিবার জন্ত মিসরে আসিয়া পৌঁছিলে, যুসুফের চক্রান্তে সে চোর বলিয়া ধৃত হইল এবং মিসরীয় আইন অনুসারে যুসুফ তাহাকে নিজের দাস করিয়া সঙ্গে রাখিয়া দিলেন।

ইহার পর ইবনু আমীনকে দেখিবার জন্ত বৃদ্ধ এয়াকুব নবীও মিসরে আসিয়া পৌঁছিলেন। পিতাপুত্রে মিসরের রাজপ্রাসাদে মিলন হইল। জোলেখা আসিয়া—

“পাখালি নবির পদ নিশ্চল করিলা।

জলিখা মস্তককেসে উপস্থার কৈলা ॥

এই প্রসঙ্গে ভ্রাতাদের সহিত যুসুফের বনিষ্ঠ পরিচয় হইল। তিনি মধুপুর রাজ্যের সুন্দরী রাজকন্যা বিধুপ্রভার সহিত ইবনু আমীনের বিবাহ দিলেন। এইরূপে সকলে মিসরে সুখে কাল কাটাইতে লাগিলেন।

এইখানেই “যুসুফ জোলেখা” কাব্যের পরিসমাপ্তি ঘটয়াছে। এই কাব্যের চরিত্র-সৃষ্টি সম্বন্ধে কিছুই বলিবার নাই। যুসুফ ও জোলেখাই এই কাব্যের মূল নায়ক ও নায়িকা। ইহাদের চরিত্রের যাহা মূল বৈশিষ্ট্য, তাহা কবির সৃষ্ট নহে। “বাইবেল” ও “কোরআনে” এই দুইটি চরিত্রের সৰল ও দুর্বল দিকের চিত্র বেশ সুন্দরভাবে অঙ্কিত আছে। কবি এই চিত্রগুলিকে বাঙ্গালা ভাষার তুলিতে রং দিয়াছেন,—ইহাই কবির একমাত্র কৃতিত্ব।

চরিত্র সৃষ্টির দিক্ হইতে কবির কোন কৃতিত্ব না পাওয়া গেলেও, তিনি যে একজন প্রতিভাবান্ কবি ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার অঙ্কিত চিত্রের আদর্শ তিনি যেখান হইতেই গ্রহণ করুন, বাঙ্গালা ভাষায় এই চিত্র অঙ্কনে তিনি নানাভাবে মৌলিকত্ব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার কবিত্বের প্রতিভা সর্বত্র না ইউক, এই কাব্যের অধিকাংশ স্থলে দোদীপ্যমান। এই কাব্যে মহাকাব্যসুলভ যে সৌন্দর্য্য (epic grandeur) রহিয়াছে, তাহা—কবি যে যুগে এই কাব্য লিখিয়াছিলেন, সে যুগে নিতান্ত দুর্বল না হইলেও অত্যন্ত সুলভও নহে। আদর্শ মানবীয় প্রেমের চিত্রকররূপে কবির বিশেষ কোন কৃতিত্ব না থাকিলেও মানুষের সুখ-দুঃখের চিত্রকর হিসাবে তিনি যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তজ্জন্ত তাঁহাকে সাহিত্যের আসরে উচ্চাসন না দিলে, তাঁহার প্রতি নিতান্তই অবিচার করা হইবে।

বাস্তবিকই কবি মোহাম্মদ সগীরকে বেদনার কবি বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। ব্যথার চিত্র অঙ্কনে এই কবি যেন সিদ্ধহস্ত। বঞ্চিত হৃদয়ের বেদনা কবির লেখনীতে এমন সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, এক একবার কাব্য পাঠ করিতে করিতে আত্মহারা হইতে হয়। কবির সহানুভূতির বৃদ্ধি এতই প্রবল যে, তিনি অতি সহজেই নায়কনায়িকার ভাবে তন্ময় হইয়া তাঁহার নিজের মধ্যে তাহাদের বেদনা পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারেন। এই জন্তই তাঁহার বর্ণিত দুঃখের চিত্রগুলি এতই করুণ ; এই জন্তই এইগুলি আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে, আলোড়িত করে। এইরূপ একটি চিত্রের নমুনা জোলেখার নিম্নোক্ত উক্তিহতে পাওয়া যায় :—

“আশ্বিন ছে পরবেশ,
থেনে ঘোর থেনেকে বিছাত ।
ক্ষেতকি বকুল ফুল,
তাহাতে ভ্রমরা রোল,
তা দেখি ধরাইতে নারি চিত ॥
খণ্ড খণ্ড মেঘগণ,
সসোদর সঃম রণ,
ডুবকি উঠএ ঘনজিত ।
তাহার নিখিল নিসি,
যুগা বিস্তারিত হাসি,
তা দেখিয়া মন বিচলিত ॥
আইল কার্তিক মাস,
চতুর্দিশ গরুকাশ,
মন্দ মন্দ দেহ প্রকুসাএ ।
তা হেরি উদাস পিআ,
বিরহে বিদরে হিয়া,
মন পক্ষি উরিছে উঃছাএ ॥ ”
নিসি দিসি উবালিত,
তারাগণ বিস্তারিত,
বহএ সমির ধির ধারি ।
ধবল কাচিআ ফুল,
জেহেন পতকা তুল,
মদন চামর চমকায় ॥

মহাভারতে স্থানীয়মানতত্ত্ব*

‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’র ১৩৪১ বঙ্গাব্দের প্রথম সংখ্যায় (১-১৩ পৃষ্ঠায়) আমরা লিখিয়া-ছিলাম, বর্তমান ‘মহাভারতে’ স্থানীয়মান সহকারে নামসংখ্যা ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার সমর্থনে যে প্রমাণটি তথায় উপস্থিত করা গিয়াছিল, উহা সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্দেহ নহে। কেন না, তাহার ভিন্নার্থও করা যাইতে পারে। তখনই তাহা প্রদর্শিত হইয়াছিল। সম্প্রতি আমরা ঐ বিষয়ে একটা নূতন প্রমাণ পাইয়াছি। উহা একেবারে অকাট্য।

‘মহাভারতে’ উক্ত হইয়াছে, অগ্নি পনর দিন ধরিয়া খাণ্ডববন দাহ করিয়াছিল। তৎসম্পর্কে মহর্ষি বৈশম্পায়ন মহারাজ জনমেজয়কে বলিয়াছিলেন,—

“তদ্বনং পাবকো ধীমন্ দীনানি দশ পঞ্চ চ।

দদাহ কৃষ্ণপার্থাভ্যাং রক্ষিতঃ পাকশাসনাৎ ॥”^১

‘হে ধীমন্! কৃষ্ণ এবং পার্থ কর্তৃক ইন্দ্র হইতে পরিরক্ষিত হইয়া অগ্নি পঞ্চদশ (‘দশ পঞ্চ চ’) দিনে সেই বন দগ্ধ করিয়াছিল।’ তাহার কিঞ্চিৎ পরে তিনি কহিয়াছেন,—

“পাবকশ্চ তদা দাবৎ দগ্ধঃ। সমুগপক্ষিণম্।

অহানি পঞ্চ চৈকঞ্চ বিররাম স্তুতর্পিতঃ ॥”^২

‘১৫ (‘পঞ্চ চৈকঞ্চ’) দিবস ধরিয়া মুগপক্ষিসমাকুল (সেই) বন দগ্ধ করত পরম পরিতুষ্ট হইয়া অগ্নি বিরত হইল।’

এই দ্বিতীয় উক্তি-স্থ ‘পঞ্চ চৈকঞ্চ’ অবশ্যই ১৫ এই সংখ্যা খ্যাপন করে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। অত্যা প্রথম বচনের ‘দশ পঞ্চ চ’ অর্থাৎ ১৫ সংখ্যার সহিত উহার বিরোধ হইবে। ইহাতে নিশ্চিতরূপে সিদ্ধ হয় যে, বর্তমান ‘মহাভারত’ সংকলনের সময়ে (৫০০ শক-পূর্বাব্দে) হিন্দুস্থানে স্থানীয়মান সহকারে নামসংখ্যা ব্যবহৃত হইত, এবং অন্ধপাতে তাহাতে বামাগতি অনুসৃত হইত। সূত্রাৎ দশাঙ্কসংখ্যাপ্রণালীও তখন জানা ছিল।^৩ এ বিষয়ে অপর স্বতন্ত্র প্রমাণ পূর্বপ্রবন্ধেই প্রদত্ত হইয়াছে।

আরও একটা দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু উহা বড় সন্দেহাস্পদ। বনবাসকালে তীর্থ-মাহাত্ম্যাবর্ণনাচ্ছলে পুরোহিত ঘোষা যুধিষ্ঠিরকে বলেন, যমুনা নদীর তীরে (‘যমুনামুখ’) অগ্নিশির নামক তীর্থে সার্কর্ভোম রাজচক্রবর্তী ভরত ‘বিংশতিঃ সপ্ত চাষ্টৌ চ’ অশ্বমেধযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

“বিংশতিঃ সপ্ত চাষ্টৌ চ হয়মেধানুপাহরণং ॥”^৪

* ১৩৪২/১৯এ ফাল্গুন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নবম মাসিক অধিবেশনে গঠিত।

১। ‘মহাভারত’, নীলকণ্ঠকৃত টীকা সমেত, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্নকর্তৃক সম্পাদিত এবং ‘বঙ্গবাসী’ কর্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৮২৬ শক, আদিপর্ব, ২২৮।৪৬

২। ঐ, আদিপর্ব, ২৩৪।১৫

৩। প্রক্ষিপ্তভাষ্যের ও পাঠভ্রান্তির শঙ্কা তুলিয়া দশাঙ্কসংখ্যাপ্রণালী ও স্থানীয়মানতত্ত্ব আবিষ্কারের প্রাচীনত্ব বিষয়ে এই নবোপস্থাপিত প্রমাণের মূল্য হ্রাস করা যাইতে পারে। কিন্তু পূর্বোক্ত বচন দুইটি প্রক্ষিপ্ত কি না এবং তাহাদের বর্তমান পাঠ অজ্ঞাস্ত কি না, তাহা নির্ধারণের উপায় কি? এই পর্বাঙ্ক ‘মহাভারতের’ যতগুলি প্রধান প্রধান সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের সকলগুলিতে উহারা আছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সুযোগ এই ক্ষুদ্র পত্রাগ্রামে লেখকের নাই।

৪। বনপর্ব, ৯০।৮

ঐ বাক্যে বিবক্ষিত সংখ্যা কোনটি? নীলকণ্ঠ মনে করেন, $১৪৮ (= ২০ \times ৭ + ৮)$ । তিনি ইহাও বলিয়াছেন, “বিংশতিঃ” স্থলে “বিংশতিং” পাঠ ধরিলে, উহা দ্বারা $৩৫ (= ২০ + ৭ + ৮)$ সংখ্যা বুঝাইত।^৫ কালীপ্রসন্ন সিংহকৃত বঙ্গভাষান্তরে^৬ এই শেবোক্ত সংখ্যাই (৩৫) উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ সংখ্যাষয়ের কোনটিই বক্তার অভিপ্রেত নহে, বোধ হয়।

‘মহাভারতে’র আরও দুই স্থলে রাজচক্রবর্তী ভরতের যজ্ঞের উল্লেখ আছে। পরমর্ষি বেদব্যাস মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন—ভরত যমুনাসমীপে (‘যমুনামন্থ’) ১০০, সরস্বতী নদীর তীরে ৩০০ এবং গঙ্গাতীরে (‘গঙ্গামন্থ’) ৪০০ অশ্বমেধযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

“সোহশ্বমেধশতেনষ্ট্ৰ। যমুনামন্থ বীৰ্য্যবান্।

ত্রিশতাবান্ সরস্বত্যাং গঙ্গামন্থ চতুঃশতান্॥”^৭

কৃষ্ণ তাঁহাকে কহিয়াছিলেন যে, ভরত যমুনাতীরে ১০০, সরস্বতীতীরে ২০ এবং গঙ্গাতীরে ১৪ অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়াছিলেন।

“যো বদ্ধা ত্রিশতং চাশ্বান্ দেবেভ্যো যমুনামন্থ।

সরস্বতীং বিংশতিঞ্চ গঙ্গামন্থ চতুর্দশ॥”^৮

এইরূপে দেখা যায়, মহারাজ ভরত যমুনাতীরে কতটি অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে বর্তমান ‘মহাভারতে’ তিন প্রকার উক্তি রহিয়াছে। ইহা বোধ হয় বলা উচিত যে, শেষের উক্তিদ্বয় নারদ-স্বজয়-সংবাদেব অন্তর্গত। আদিতে দেবর্ষি নারদ মহারাজ স্বজয়ের পুত্রশোক অপনোদনের জন্ত তাঁহাকে সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মপরাশর প্রাচীন যোজ্ঞ জন রাজার কাহিনী শুনাইয়াছিলেন। অভিমত্মশোকবিহ্বল মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সাঙুনা দিবার জন্ত মহর্ষি ব্যাস তাঁহার নিকটে ঐ বোড়শ-রাজিক উপাখ্যান বিবৃত করেন। কুরুক্ষেত্রমহাসমরের পরে যুধিষ্ঠিরের শোকাপনোদনার্থ কৃষ্ণ উহার পুনরাবৃত্তি করেন। তাঁহাদের দুই জনের উক্তিতে ঐ প্রকার ভেদ অবশ্যই পাঠ্যমঞ্জরিতে বলিতে হইবে। প্রকৃত পাঠ যে কি, বিশেষতঃ রাজচক্রবর্তী ভরত যমুনাসমীপে কত অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয়ের উপায়ও দেখা যায় না। ‘ভাগবতে’র উক্তি বিষয়টিকে আরও জটিল করিয়া দিয়াছে। তথায় আছে, ভরত যমুনাসমীপে ৭৮ ও গঙ্গাসমীপে ৫৫, মোট ১৩৩ (‘ত্রয়স্তিংশচ্ছতং’) অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়াছিলেন।

“বিংশতিঃ সপ্ত চাষ্টী চ” বাক্যের ‘বিংশতিঃ+সপ্ত চাষ্টী চ’ এই প্রকারে পদযোজনা করিলে এবং ‘সপ্ত চাষ্টী চ’ পদে নামসংখ্যা প্রযুক্ত হইয়াছে ধরিলে, বিবক্ষিত সংখ্যা হইবে, বামাগমিতে $২০ + ৮৭ = ১০৭$, অথবা দক্ষিণাগমিতে $২০ + ৭৮ = ৯৮$ । এই শেষের সংখ্যাটাই (৯৮) এক শতের সর্বাপেক্ষা অধিক আদম্ভ। উহাকেই মহর্ষি ব্যাস স্থূলভাবে শত বলিয়া উলেখ করিয়াছেন, অনুমান করা যাইতে পারে। ‘সপ্ত চাষ্টী চ’ সংখ্যাকে ৭৮ বলিয়া গ্রহণ করিলে, ‘ভাগবতে’র উক্তির সঙ্গেও কতকটা সঙ্গতি থাকে।

শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত

৫। নীলকণ্ঠের উক্তি এই,—“বিংশতিঃ বিংশতিবারমাবর্তিতঃ সপ্ত অষ্টৌ চেতি অষ্টচক্রাংশদধিকং শতম্। অয়স্তিংশচ্ছতং রাশেতি তু শ্রুতিঃ। বিংশতিমিতি পাঠেহত্যন্তহীনসংখ্যায়াং পঞ্চত্রিংশৎ।”

৬। কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অনুদিত মহাভারত, কলিকাতা, হিতবাদী-কার্যালয় হইতে প্রকাশিত, ১৩১০ সাল, নবমতম অধ্যায়, ২৫১ পৃষ্ঠা।

৭। দ্রোণপর্ব, ৩৬।৮

৮। শান্তিপর্ব, ২৯।৪৬

ইংরেজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলারি

C. L. Mookerjee

AN EXTENSIVE

VOCABULARY,

Bengalese and English & Urdu

VERY USEFUL

TO TEACH THE NATIVES ENGLISH,

AND

TO ASSIST BEGINNERS IN LEARNING

THE BENGAL LANGUAGE.

CALCUTTA,

PRINTED AT THE CHRONICLE PRESS.

MDCCXCIII.

ক		
কাঁটালিকলা	a plantain of an angular kind	কাঁটালিকলা
কাটাইতে	to cause to cut	কাটাইতে
কাটাৰ	a poignard, dagger	কাটাৰ
কাটাৰি	a crooked broad knife	কাটাৰি
কাটিতে	to cut, to hew	কাটিতে
বটিতে আঁঘর	to blot a letter	কাটিবাকু
কাটনাকাটিতে	to spin	কাটিবাকু
কাটবা	a fence of boards	কাটনাকাটিতে
কাটুরা	a wood-cleaver	কাটবা
কাঁটা	a thorn, a fork, a fish-bone	কাটুরা
কাট	wood	কাঁটা
কাট বেবাল	a squirrel	কাট
কাঠের	wooden, of wood	কাট বেবাল
কাঠখড়	fire-wood	কাঠের
কাঠের মাড়	a float of timber	কাঠখড়
কাঠা	a measure, a cotta or piece of ground	কাঠের মাড়
	[4 ells square	কাঠা
কাডাকাড়ি	force, violence	কাডাকাড়ি
কাড়িয়া আনিতে	to get by force	কাড়িয়া আনিতে

বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাংলা অভিধান*

এখন পর্যন্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গবেষণার ফলে যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে পাজ্রি মানোএল-দা-আল্ফুন্সাম-দাউঁ রচিত *Vocabulario Em Idioma Bengalla, E. Portuguez* নামক গ্ৰন্থকেই সর্বপ্রথম বাংলা শব্দসংগ্রহ বা অভিধান বলা যাইতে পারে। এই গ্ৰন্থক ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ও ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে^১ পোর্তুগালের রাজধানী লিসবন নগরে Francisco Da Sylva র ছাপাখানায় মুদ্রিত হইয়াছিল। বইটি সম্পূর্ণ রোমান হরফে ছাপা। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে বিখ্যাত চার্লস উইলকিন্স সর্বপ্রথম^২ নিজের ছেনি কাটিয়া বাংলা হরফ ঢালাই করেন। নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড কর্তৃক ইংরেজীতে লিখিত বাংলা ব্যাকরণ *A Grammar of the Bengal Language* নামক গ্ৰন্থকে সেই হরফ প্রথম ব্যবহৃত হয়। পরে অষ্টাদশ শতাব্দীতেই সম্পূর্ণ বাংলা অক্ষরে কয়েকটি আইনের গ্ৰন্থক মুদ্রিত হয়। ইউরোপীয়গণ কর্তৃক বাংলা এবং দেশীয়গণ কর্তৃক ইংরেজী শিক্ষার সেই প্রথম যুগে ইংরেজী বাংলা এবং বাংলা ইংরেজী শব্দসংগ্রহ (vocabulary) বা অভিধানও প্রস্তুত হইবার কথা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আমরা এতদিন পর্যন্ত ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে মুদ্রিত কোনও অভিধানের সন্ধান পাই নাই।

* ১৩৪৪/১৩ই আষাঢ়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১. "The First Bengali Grammar and Dictionary were in Portuguese. The title of the work is *Vocabulario em Idioma Bengalla e Portuguez dividido em duas partes.....Lisboa, 1743*. Bengali Grammar, pp. 1—40; Vocabulary Bengali-Portuguese, pp. 41—306; Portuguese-Bengali, pp. 307—577. The whole is in the Roman character; the words being spelt according to the rules of Portuguese pronunciation".—Sir George Grierson, *Linguistic Survey of India*, vol. v, pt. 1, p. 23.

"এই বইয়ের দুইখানি প্রতিলিপি লণ্ডনে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের গ্ৰন্থভাগারে আছে। একখানি খণ্ডিত, আর খানি সম্পূর্ণ।.....পৃষ্ঠা সংখ্যা X, 592; প্রথম দশ পৃষ্ঠা ভূমিকা প্রভৃতি লইয়া; তৎপরে ১—৪০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ব্যাকরণ; তৎপরে ৪১—৫৯২ পর্যন্ত বাঙ্গালা শব্দসংগ্রহ, ৪১—৩০৬ পর্যন্ত বাঙ্গালা পোর্তুগীস, ও ৩০৭—৫৭০ পর্যন্ত পোর্তুগীস-বাঙ্গালা; এবং ৫৭১—৫৯২ পর্যন্ত বাকী পৃষ্ঠায় নানারূপ শব্দ শ্রেণী হিসাবে সংগৃহীত হইয়াছে—"ডক্টর হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'পাজ্রি মানোএল-দা-আল্ফুন্সাম-দাউঁ-রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ'—(কলি. বি. বি.) এর প্রবেশক পৃঃ ১। এই গ্ৰন্থকে মূল বহির টাইটেল পেজ ও চারিটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি আছে।

উপরোক্ত দুই জনই বইটি চেখে দেখিয়া আলোচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আলোচনা করিয়াছেন, Father H. Hosten, *Bengal: Past & Present*, vol. IX, pt. 1, p. 42; vol. XIII, pt. 1, pp. 67—68 (ইহাতে মূল বহির টাইটেল পেজ ও অপর দুইটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি আছে); ডক্টর হুনীতিকুমার দে—*Bengali Literature in the Nineteenth Century* (C. U. 1919) p. 75 ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৩ এবং কেশবনাথ মল্লিক, 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য', ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ১৭ (ইহাতে টাইটেল পেজের প্রতিলিপি আছে)।

২. হালহেডের ব্যাকরণের ভূমিকা, পৃঃ XXIII-XXIV.

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে হেনরী পিট্‌স ফরষ্টার ('Senior Merchant on the Bengal Establishment') প্রণীত *A Vocabulary, in two parts, English and Bongalee, and Vice Versa* নামক পুস্তকের প্রথম খণ্ড (ইংরেজী হইতে বাংলা) কলিকাতার 'Ferris and Co.'র প্রেসে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। পুস্তকের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ii + XX + 421। ইহারই দ্বিতীয় খণ্ড (বাংলা ইংরেজী) উপরোক্ত প্রেস হইতে ১৮০২ সালে প্রকাশিত হয় ; পৃষ্ঠা-সংখ্যা 443 + IX। লড্‌ সাহেবের মতে এই পুস্তকে প্রায় ১৮০০০ বাংলা শব্দ আছে। (*A Descriptive Catalogue of Bengali Books*, p. 2)। এতদিন পর্যন্ত বাংলা হরফে মুদ্রিত অভিধানগুলির মধ্যে এই পুস্তকটিই আদিমতম বলিয়া পরিকল্পিত হইয়া আসিয়াছে। ফরষ্টার সাহেবের নিজেরও ধারণা ছিল যে, তিনিই সর্বপ্রথম এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিলেন এবং পরবর্ত্তী অভিধান-কারেরাও (যথা উইলিয়ম কেরী—১৮১৫-২৫, রামকমল সেন—১৮১৭-৩৩, তারাচাঁদ চক্রবর্তী—১৮২৭, জন মেণ্ডিস—১৮২৮, জি. সি. হটন—১৮৩৩ প্রভৃতি) তাঁহাকেই এই সম্মান দিয়াছেন ; ফলে, এখন পর্যন্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যতগুলি ইতিহাস রচিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিতেই ফরষ্টারকৃত অভিধানটিই বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত সর্বপ্রথম অভিধান বলিয়া উল্লিখিত হয়।

এখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাংলা ও ইউরোপীয় ভাষায় অভিধান সংকলনের চেষ্টার উল্লেখ অগ্রাসঙ্গিক হইবে না। পুরাতন পুস্তক ও পত্রিকাদি পড়িতে পড়িতে বিভিন্ন ব্যক্তির সংকলনের পরিচয় মাত্র পাওয়া গিয়াছে, সেই সকল সংকলন কার্যে পরিণত হইয়াছিল কি না, তাহার প্রমাণ নাই। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার *The Origin and Development of the Bengali Language* পুস্তকের ১ম খণ্ডের ২৩৪ পৃষ্ঠায় Augustin Ausant প্রণীত ফরাসী-বাংলা শব্দাবিধানের (১৭৮১-৮৩ খ্রীঃ) উল্লেখ করিয়াছেন ; ইহা পাণ্ডুলিপি আকারেই আছে। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল তারিখে *Calcutta Gazette*-এ একটি বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল, তাহাতে কয়েক জন বঙ্গদেশবাসী উপযুক্ত লোককে একটি বাংলা ব্যাকরণ ও অভিধান প্রণয়নের অনুরোধ জানাইতেছেন^৩। অনুরোধের ধরণ দেখিয়া মনে হয়, তখন পর্যন্ত তাঁহাদের ব্যবহারার্থ কোনও ইংরেজী-বাংলা অভিধানের প্রচলন ছিল না। সুবিখ্যাত রামকমল সেন তাঁহার *A Dictionary in English and Bengalee* (Serampore Press, 1834) পুস্তকের ভূমিকায় (p. 17) কিন্তু লিখিয়াছেন—

৩. "Card. The humble request of several Natives of Bengal. We humbly beseech any gentleman will be so good to us as to take the trouble of making a Bengal Grammar and Dictionary, in which we hope to find all the Common Bengal Country words made into English. By this means we shall be enabled to recommend ourselves to the English Government and understand their orders ; this favor will be gratefully remembered by us and our posterity for ever"—Seton Karr, *Selections form Calcutta Gazettes*, vol. II, p. 497.

"In 1774 the Supreme Court was established here, and from this period a knowledge of the English language appeared to be desirable and necessary. In tracing the progress made, it appears that a Brahmin named *Rāmram Misra* was the first who made any considerable progress in the English language, but it is not known how he learnt it, or by whom he was taught. He himself taught several Baboos and amongst them *Ramnarain Misra*, a clerk to an attorney of the Supreme Court, who was considered to be a scholar and a great lawyer into the bargain, for he could draw up petitions, and knew the forms and practice of the pernicious system of law which has ruined almost every family of note in Calcutta, who were subject to its jurisdiction. By it he made his fortune, there not being his equal at the time. He afterwards kept a school, in which he taught a number of Hindoo youth, and received from them a monthly fee of from 4 to 16 Rs. each. Before his time however there was another individual named *Anondiram Doss*, who knew a still greater number of English words than *Ramnarain*. This man had a vocabulary or collection of words which was considered a treasure of English knowledge, and a number of young Hindoos used to attend daily upon him for hours and to wait his pleasure and convenience to get some scraps from his book. This pious philanthropist used to give out five or six words everyday for their study. A specimen of the words in Bengalee characters with their meaning is as follows.

লার্ড.....(Lord,)	ইশ্বর।
গাড.....(God,)	ইশ্বর।
কম.....(To come,)	আইশ।
গো.....(To go,)	জাও।
গোইন.....(Going,)	জাইতেছি।

Ramlochan Napat, Krishnamohan Bose and some others also used to teach English in the same manner as many writers in public offices do to this day. Sometime after this, *Bhubani Dutt, Sibū Dutt*, and a few others were celebrated as complete English Scholars, among the Hindoos; *Mr. Franco*, called *Panchito*, also opened a school about this time which was followed by another, kept by one *Aratoon Pitrus*, several of whose scholars are still living. At that time there were no other elementary books than *Thomas Dyche's* Spelling Book and Schoolmaster. The Arabian Nights and the tootee nameh came many years after; those who could read any of these were reckoned learned men, and those who could run over the rules of Grammar at the end of the spelling books, were considered masters of the language."

উপরোক্ত অংশ বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করিলাম এই জন্ত যে, এই সময়ের ইংরেজী শিক্ষার প্রচেষ্টার ইতিহাস অত্র কোথায়ও পাওয়া যাইতেছে না এবং চুঃখের বিষয়, উল্লিখিত ব্যক্তিদের সম্বন্ধেও আর কিছু জানা যায় না। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু তাঁহার 'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত' ও 'দৈকাল আর একালে' বাঙ্গালীর প্রথম ইংরেজী শিক্ষার সংসামান্য ইতিহাস দিয়াছেন। তিনি টমাস ডিস্, আরাটুন পিট্রস, রামরাম মিশ্র ও কৃষ্ণমোহন বসুর উল্লেখ করিয়াছেন। *Bengal: Past & Present* এর দ্বাদশ ভাবুমে রামকিশণ মিশ্রের অত্র প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে। ইহাদের কাহারও শব্দসংগ্রহ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, তাহাও জানিবার উপায় নাই।

Sir G. C. Haughton তাঁহার *A Dictionary, Bengali and Sanskrit*, (London, 1833) পুস্তকের ভূমিকায় (পৃ: VII) লিখিয়াছেন, স্তার চার্লস উইলকিন্স বঙ্গদেশে অবস্থানকালে (১৭৭০-১৭৮৬ খ্রী:) তিনটি সংস্কৃতমূলক শব্দের তালিকা সংকলন করেন; তাহা পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই আছে* ।

উইলিয়াম কেরী মালদহের মদনাবতীতে অবস্থানকালে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে বারমিংহামের মিঃ পিকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার বাংলা ভাষার একটি অভিধান লিখিতে আরম্ভ করার কথা আছে* । কিন্তু তাঁহার বিখ্যাত কোয়ার্টো বাংলা-ইংরেজী অভিধানের মুদ্রণকার্য ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হইয়া ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হয় ।

স্মৃতির বিষয়, সম্ভ্রুতি এইগুলি ছাড়াও আর দুইটি বাংলা-ইংরেজী শব্দসংগ্রহের সম্মান আমরা পাইয়াছি । দুইটি পুস্তকই যে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই বাংলাদেশেই মুদ্রিত, প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । কি অজ্ঞাত কারণে ফরষ্টার এবং পরবর্তী অভিধান-কারেরা এই পুস্তক দুইটির সম্মান পান নাই, অথবা সম্মান পাইয়া থাকিলেও তাহার উল্লেখ মাত্র করেন নাই, তাহা ভাবিবার বিষয় । ইহার প্রথমখানি ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয়খানি ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল* । সুতরাং ফরষ্টারের অভিধান প্রথম বাংলা অভিধান হিসাবে এককাল যে সম্মান পাইয়া আসিতেছিল, এখন ইহাতে ১৭৯৩ সালে ছাপা অভিধানটিকেই সেই সম্মান দিতে হইবে ।

এই প্রবন্ধে আমরা এই পুস্তকটি লইয়াই আলোচনা করিব । ইহার আবিষ্কারের একটু ইতিহাস আছে । প্রাচীন বাংলা মুদ্রিত পুস্তক সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর প্রথম ভলুম ক্যাটালগের (১৮৮৮ খ্রী:) ৩৯৫ পৃষ্ঠায় "Extensive Vocabulary of Bengali, English and Udiya. 2 vols. Calcutta, 1793" এই নামটি দেখিতে পাই । ফরষ্টারের প্রথমতম বাংলা অভিধানের কথা স্মরণ করিয়া '১৭৯৩'কে ছাপার ভুল বলিয়াই ধরিয়া লই । তথাপি ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীকে পত্র লিখি । উক্তরে জানিতে পারি, ভুল নয়, বইখানি

৪. "To his friend Sir Charles Wilkins thanks are due for the loan of three Ms. list of words collected during the course of that distinguished scholar's studies while resident in Bengal."

৫. "I have also begun to write a dictionary of the language, but this will be a work of time ;"—*Periodical Accounts Relative to the Baptist Missionary Society* Vol. I, Pt III, p. 223.

* দ্বিতীয় শব্দসংগ্রহটি ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশেই মুদ্রিত হইয়াছিল । ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১৬৪ । আমরা ভবিষ্যৎ-এই পুস্তকটিরও বিস্তৃত আলোচনা দিতে চেষ্টা করিব । এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা ভাল যে, এখন পর্যন্ত বাংলা-ইংরেজী অভিধানগুলি বিদেশীয়দের দ্বারা সংকলিত হইয়াছে । আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে বাঙালী-রচিত সর্বপ্রথম বর্ণানুক্রমিক বাংলা অভিধানকার হিসাবে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নাম করিতে হয় । তাঁহার 'বঙ্গভাষাভিধান' ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল ।

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দেই ছাপা, কিন্তু ক্যাটালগের নামে ভুল আছে। বইখানির নাম—“An Extensive Vocabulary, *Bengalese and English.*” ‘and Udiya’ শব্দ দুইটি পুস্তকের মূল মালিকের হাতে লেখা; তিনি নিজের ব্যবহারের জন্ত পুস্তকটিকে ‘ইণ্টারলিফ’ করিয়া দুই ভাগে বিভাজিত প্রত্যেকটি শব্দের ওড়িয়া প্রতিশব্দ হাতে লিখিয়া রাখিয়াছেন। যথাসময়ে ইণ্ডিয়া অফিসে রক্ষিত পুস্তকের টাইটেল পেজ, ভূমিকা ও অভিধান-অংশের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি আমাদের হস্তগত হয়। টাইটেল পেজ ও অভিধান পৃষ্ঠার প্রতিলিপি এই প্রবন্ধে মুদ্রিত হইল।^৬

পুস্তকটির নাম—

ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি

An Extensive
Vocabulary,

Bengalese and English,
Very useful

To Teach the Natives English,
And

To Assist Beginners in Learning
The Bengal Language.
Calcutta,

Printed at the Chronicle Press.

M D C E X C III

ক্রনিকল প্রেসের নাম মাত্র আছে, গ্রন্থকারের অথবা মুদ্রাকরের কোনও নাম নাই। ক্রনিকল প্রেসের স্বত্ব ধরিয়া আমরা গ্রন্থকারকে বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছি, এখন পর্য্যন্ত সফলকাম হই নাই। গ্রন্থকার ভূমিকাতোও আত্মপরিচয়ের কোনও স্বত্ব ধরিয়া দেন নাই। ভূমিকাটি যথাযথ উদ্ধৃত করিতেছি।

PREFACE.

The Author spent ten years in compiling and revising this work. He is very sensible of its defects; but as it is the first of the kind, and promises much utility in diffusing the English language among the Natives, he hopes it will be candidly received by the Publick. The Printer engages to furnish to every Purchaser a complete Index, as soon as it can be prepared, gratis.

৬. ইণ্ডিয়া অফিসে রক্ষিত পুস্তকটির আরও একটু ইতিহাস আছে। ইহার মালিক ছিলেন Rev. Brooks, তিনি ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কটক হইতে ‘An Oriya and English Dictionary’ প্রকাশ করেন। ইণ্ডিয়া অফিসে রক্ষিত ইংরেজী-বাংলা অভিধান হইতে বুঝা যায়, তিনি এইটিকে আদর্শ করিয়াই ওড়িয়া অভিধান প্রণয়ন করেন।

সৌভাগ্যক্রমে, এই পুস্তকের একটি খণ্ডিত প্রতিলিপি শোভাবাজার রাজবাটীতে রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরীতে খুঁজিয়া পাই*, পরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাগারেও ইহার একটি খণ্ডিত প্রতিলিপি প্রাপ্ত হই। টাইটেল পেজ, ভূমিকা ইত্যাদি না থাকাতে ইহা 'মিলার সাহেবের অভিধান (১৮০১)', এই ভুল নামে তালিকাভুক্ত হইয়া আছে*। আশ্চর্যের বিষয়, হাতের কাছে এই পুস্তকের এতগুলি কপি থাকা সত্ত্বেও ইহা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকদের নজর এড়াইয়া গিয়াছে। এই অভিধান সম্পর্কে আমরা সর্বপ্রথম ১৩৪৩ সনের আশ্বিন সংখ্যা শনিবারের চিঠিতে (পৃঃ ১৫৮১) উল্লেখ করি ও পরে কার্তিক সংখ্যা শনিবারের চিঠির ৩২ ও ১৪৫-৬ পৃষ্ঠায় ইহার সামান্য পরিচয় প্রদান করি।

প্রথমটা আমাদের সম্মুখে হইয়াছিল, রামকমল সেনের ভূমিকায় উল্লিখিত 'আনন্দিরাম দাসের' শব্দসংগ্রহই পরবর্তী কালে 'ইংরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি' নাম লইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু এই সম্মুখের সপক্ষে আমরা কোনও প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় *Calcutta Chronicle* নামে একটি ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইত। কলিকাতার ম্যাপ প্রস্তুতকারক সুবিখ্যাত A. Upjohn ইহার মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন। ইহাদের অফিস ও ছাপাখানা ছিল ৮ নং লালবাজার। কলিকাতা ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীতে ১৭৯২ ও ১৭৯৩ এই দুই সালের *Calcutta Chronicle* আছে। তাহা হইতে জানা যায়, প্রেসের নাম ছিল 'Calcutta Chronicle Press'; এই প্রেসটিই অভিধানের টাইটেল পেজে 'Chronicle Press' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এ. আপজন সাহেব *Calcutta Chronicle* (প্রেস ও পত্রিকা)-এর এক-ষষ্ঠাংশের মালিক ছিলেন। তিনি ১৭৯২ সালের গোড়ার দিক্ হইতেই দুরবস্থায় পতিত হন ও তাঁহার অংশ ইস্তাস্তরিত করিবার চেষ্টা করেন। কলিকাতা গেজেটের সেটন-কার-কৃত সঙ্কলনে ও ক্যালকাটা ক্রেনিকল সাপ্তাহিকের বিভিন্ন সংখ্যায় আপজন সাহেবের সম্পত্তি বিক্রয় বিষয়ে নানা অদ্ভুত বিজ্ঞাপন দেখিতে পাওয়া যায়*। কিন্তু এই দুর্দশার মধ্যেও আপজন সাহেবের অদম্য উৎসাহের অন্ত ছিল না; তাঁহার সম্পত্তি বিক্রয়ের চেষ্টা চলিতেছে, এই অবস্থাতেই তিনি তাঁহার পত্রিকায় (Tuesday, March 20, 1792, Vol. VII, No. 322) বিজ্ঞাপন দিয়া বসিলেন,—

New Publications, In the Press, And speedily will be published, An Extensive Vocabulary, Bengalese and English, Very useful to teach the Natives English and to Assist Beginners in Learning the Bengal Language. Those who wish for the works are requested to send their orders to Mr. Upjohn.

ইংরাজ এবং বাঙ্গালি লোকের/ সিখিবার কারন এক বহি অতি/ সিদ্ধ ছাপাখানায় তৈয়ার হইবে/ক সাহেব লোকে বাঙ্গলা কথা/ সিখিবেক এবং বঙ্গালি লোকে/ ইংরাজি কথা সিখিবেক অত্র/ব সবল লোকের কেরাএত্র/ কারণ এই বহি তৈয়ার করা জা/ইতেছে জে ২ লোকে চাহে তা/হারা মেং আবজান সাহেবের/ ছাপাখানায় আসিয়া লইবেক/ ইতি সন ১৭৯২ ইংরাজী/ তারিখ ১৯ মার্চ সন ১১৯৮/ বাঙ্গলা তারিখ ৯ চৈত্র।

১. বাংলা আলমারীর ১৪২ (জে) সংখ্যক বই।

২. দুপ্পায়া গ্রন্থের তালিকায় ২৩ নং বই।

৩. 'বেঙ্গল : পাঠ এণ্ড প্রজেক্ট'-এর চতুর্দশ ভাগুমেও এ বিষয়ে অনেক থবর আছে।

এই বিজ্ঞাপনটিই ঘুরিয়া ফিরিয়া এবং সামান্য সামান্য পরিবর্তিত হইয়া ১৭৯৩ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত বার বার বাহির হয়। “Price Twelve Rupees” এই অংশটিও কয়েক বার জুড়িয়া দেওয়া হয়। আপজন সাহেব নিজেই হউক অথবা অপর কাহাকেও দিয়া হউক, অভিধানটি সংকলন ও মুদ্রণ করিতে থাকেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ তারিখের ক্যালকাটা ক্রনিকলের একটি বিজ্ঞাপনে অফিস ও প্রেস ঝালবাজার হইতে চিংপুর রোডে Le Blancএর গৃহে উঠিয়া যাওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়। আপজনের সহিত ক্যালকাটা ক্রনিকলের সম্পর্কও ওই সঙ্গে শেষ হয় এবং তৎপরেই ১৬ই এপ্রিলের কাগজে এই বিজ্ঞাপন দেখিতেছি,—

Just Published,/ At the Chronicle Office, Chitpore Road,/ (Price four Rupees,)/ ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি/ বোকেবিলরি/ An Extensive/ Vocabulary,/ Bengalese and English ;/ very useful to Teach the natives English/ And/ To Assist beginners in learning the/ Bengal Language.

বারো টাকা হইতে চার টাকায় দাম নামিয়া আসাতে বোধ হইতেছে, পুস্তকটি প্রথমে যত বৃহৎ হইবে বলিয়া প্রকাশক আশা করিয়াছিলেন, ঠিক তত বড় হয় নাই। মনে হয়, সম্পত্তি বিক্রয় ও হস্তান্তর ব্যাপারেই নানাবিধ গোলযোগ ঘটে এবং এই পুস্তক তেমন ভাবে প্রকাশ ও প্রচার না হওয়ার ইহাই সম্ভবতঃ কারণ।

এই অভিধান যাহার দ্বারাই সংকলিত হইয়া থাকুক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক এ. আপজন ছাড়া আর কাহারও নামের সহিত এখনও ইহা যুক্ত করা যায় না। সুতরাং আপাততঃ ইহাকে ক্রনিকল প্রেসে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে (১৬ এপ্রিল তারিখের পূর্বে) ছাপা আপজনের ইংরেজী-বাংলা অভিধান বলিয়াই উল্লেখ করিতে হইবে।

পুস্তকটি প্রায় ডবল ক্রাউন যোলপেজী সাইজের; টাইটেল পেজ ও ভূমিকা স্বতন্ত্র, মূল অভিধানের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৪৪৫। প্রত্যেক পৃষ্ঠার বাঁদিকে বাংলা ও ডান দিকে তাহার ইংরেজী প্রতিশব্দ দেওয়া আছে। শব্দগুলি বর্ণানুক্রমে সাজানো হইলেও ব্যঞ্জন বর্ণ পূর্বে স্থান পাইয়াছে। ১-৩৯৩ পৃষ্ঠার অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত ব্যঞ্জন বর্ণ, ৩৯৩-৪৪৫ পৃষ্ঠা স্বরবর্ণ। সকল শব্দ ঠিক বর্ণানুক্রমে সাজান নাই। শব্দ ছাড়া অনেক বাক্য ও বাক্যাংশও অনুবাদ-সমেত দেওয়া হইয়াছে।

এই অভিধানের শব্দগুলি ভাষাবিদের বিশেষ আলোচনার যোগ্য; অনেক শব্দ বর্তমানে অপ্রচলিত, অনেক শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, সংস্কৃত তৎসম ও তদ্ভব শব্দের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক কম; দেশজ শব্দ অত্যন্ত বেশী; মুসলমানী শব্দও কম নয়। ফরষ্টারের অভিধান হইতে বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত করিবার যে চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল, এই অভিধানে তাহার কোনই চিহ্ন নাই^{১০}। এই শব্দ বিচারের জন্তই এই প্রাচীনতম অভিধানটির সম্পূর্ণ পুনর্মুদ্রণ আবশ্যিক। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতেই এই চেষ্টা হইলে শোভন হইবে।

১০. এই বিশুদ্ধীকরণ প্রচেষ্টা সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত কোনও শব্দতান্ত্রিক আলোচনা করেন নাই। ১৭৯৯ হইতে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই আলোচন প্রবলবেগে চলিয়াছিল এবং তাহার ফলেই বাংলা অভিধানে সংস্কৃত-প্রভাব অত্যন্ত বেশী হয়। কোনও পণ্ডিত ব্যক্তি এ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে অনেক রহস্য উদ্ঘাটিত হইতে পারে।

আমরা বারাস্তরে ভাষা ও শব্দতত্ত্বের দিক দিয়া এই পুস্তকের সাধামত আলোচনা করিব। যে সকল শব্দ বর্তমানে অপ্রচলিত অথবা অর্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার একটি তালিকা আমরা সেই সঙ্গে প্রকাশ করিব। অক্ষরের নমুনা ও শব্দদঙ্কলনের ধরণ নমুনা পৃষ্ঠা হইতেই সম্যক বুঝা যাইবে।

শ্রীসজনীকান্ত দাস।

দ্বিজ রামচন্দ্র বা কবিকেশরী রামচন্দ্র

তর্কালঙ্কার

দ্বিজ রামচন্দ্র বা কবিকেশরী রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার সম্বন্ধে ‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’র একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।* এই সকল প্রবন্ধে কবির কোন কোন কাব্যের—প্রধানতঃ হস্ত-লিখিত পুথি হইতে—পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিজ রামচন্দ্র সেকালের এক জন খ্যাতনামা কবি ও শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন এবং বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থের সম্যক আলোচনা হওয়া উচিত। কিন্তু পূর্ববর্তী লেখকেরা তাঁহার সকল রচনার সন্ধান পান নাই। অথ একটি ব্যাপারে অনুসন্ধান কালে আমি দ্বিজ রামচন্দ্রের অনেকগুলি মুদ্রিত গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি; বর্তমান প্রবন্ধে সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার চেষ্টা করিলাম। এই গ্রন্থপঞ্জী তাঁহার চরিতকারের কাজে লাগিতে পারে।

(১) দুর্গামঙ্গলাস্তর্গত ‘গৌরীবিলাস’। পৃ. সংখ্যা ১৪০ + ১২৯ + ৩ (শুদ্ধিপত্র) + ৪ (স্বাক্ষরকারিদিগের নাম)।

রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে এই গ্রন্থের এক খণ্ড আছে কিন্তু তাহার আখ্যাপত্র নাই। ইহাতে ৬ খানি চিত্র আছে; তন্মধ্যে ২ খানি কাঠখোদাই, ৪ খানি লাইন-এনগ্রেভিং। গ্রন্থ দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে—গৌরীবিলাস, তাহার পৃ. সংখ্যা ১-১৪০। দ্বিতীয় ভাগে—কঙ্কালীর অভিষেক, তাহার পৃ. সংখ্যা ১-১২৯। প্রথম ভাগের শেষ কয় পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি:—

এত বলি পার্কতী হানিল অসি দুর্গাস্বরে।

পড়িল দম্ভপতি পুষ্পবৃষ্টি হরপুরে ॥

দুর্গাস্বর সংহারিয়া হৈল মার দুর্গা নাম।

কি কব নামের গুণ নাহি তার অনুপাম ॥

ব্রহ্মহত্যা আদি করি পঞ্চম মহাপাতকী।

দুর্গা নামে মুক্ত হয় অশেষ আর নারকী ॥

দুর্গানাম মাহাত্ম্য কিঞ্চিৎ এইত শুনিলা।

অতঃপর ইতিহাস কহি একাধর লীলা ॥

কঙ্কালী জন্মিল শাপে গোড়ে ভূপতি কত।

দ্বিজ রামচন্দ্র কবি কহে শুনহ হৃদয়া— (পৃ. ১৪০)

ইহার পর দ্বিতীয় ভাগ আরম্ভ। ইহার পৃষ্ঠাঙ্কও পুনরায় ১ হইতে আরম্ভ করা হইয়াছে। আমরা সমগ্র গ্রন্থের নির্যস্টটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।—

* (১) “দ্বিজ রামচন্দ্রের দুর্গামঙ্গল কাব্য”—শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, ১ম সংখ্যা, ১৩০৫।

(২) “দ্বিজ রামচন্দ্রের প্রকৃত কালনির্ণয়”—রমেশচন্দ্র বসু, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩০৫।

(৩) “দ্বিজ রামচন্দ্র-রচিত হরপার্বতী-মঙ্গল”—দুর্গাদাস রায়, ২য় সংখ্যা, ১৩২৭।

(৪) “রামচন্দ্র কবিকেশরী বা দ্বিজ রামচন্দ্র”—শ্রীনিভাধন ভট্টাচার্য্য, ৩য় সংখ্যা, ১৩৪০।

নির্ঘণ্ট পত্র

গণেশের বন্দনা	১	হিমালয়ের দর্পচূর্ণ	১৮
চৈতন্য বন্দনা	২	মহাদেবের নিকটে গৌরীর বিদায়	১০২
গুরুদেব বন্দনা	২	হিমালয়ে আগমন	১০৪
সরস্বতী বন্দনা	৩	মহাদেবের আগমন	১০৬
গঙ্গার বন্দনা	৪	কৈলাসে উমার গমন	১১০
লক্ষ্মীর বন্দনা	৫	দেবতারিণিগের স্তব	১১২
সর্বদেব বন্দনা	৫		
বাসুদেব বন্দনা	৭	অষ্টম পালারস্ত এবং গণেশের জন্ম	১১৫
কালী বন্দনা	৮	ভদ্রকালী মূর্তি	১১৭
ভগবতী বন্দনা	৯	ককরাঙ্গি স্তব	১১৮
প্রস্থোপাখ্যান	১০	কার্তিকের স্তব	১২০
স্বদেশের কথন	১২		
অগস্ত্যের কাশী পরিত্যাগ	১৩	নবম পালারস্ত এবং তারকাহরের যুদ্ধ	১২৬
শক্তি নিরূপণ	১৪	তারকাহর বধ	১৩৩
শ্রীমামূর্তি প্রকাশ	১৫	ছূর্ণানাম মাহাত্ম্য	১৩৭
রাক্ষরাজেশ্বরী রূপ বর্ণনা	১৬	প্রথম পরিচ্ছেদ	১৪০
সরস্বতীর উৎপত্তি	১৭		
হৃষ্টির আরম্ভ	১৮	ভগবতীর এক'ধর যাত্রা	১
অমৃত মহন	১৯	কেংকালীর অভিশাপ	৩
দক্ষযজ্ঞ	৩৪	বেদবতীর জন্ম	৪
		বেদবতীর বিবাহ	৭
দ্বিতীয় পালারস্ত এবং হিমালয়ে উমার জন্ম	৩৫	সম্রাটের ঔষধগ্রহণ	১২
মহাদেবের তপস্তা	৪৪	বাসর বর্ণনা	১৪
তারকাহরের উপাখ্যান	৪৫	ব্রহ্মপুত্র নদের আগমন	২২
রতি বিলাপ	৪৯	রাণীর ঘান	২৩
		উভয় দাসীর কথা	২৯
তৃতীয় পালারস্ত উমার তপস্তা	৫৪	বড় রাণীর কাছে রুমির কথা	৩২
ব্রহ্মচারীবেশে শিবের আগমন	৬৬	ক্ষমার আগমন এবং হিংসা বর্ণনা	৩৩
নারদের আগমন	৭২	বিবৃশস্মার সহিত ব্রাহ্মণীর কথা	৩৯
		রাজার নিকটে গণকের আগমন	৪২
চতুর্থ পালারস্ত এবং বিবাহ উদ্ভোগ	৭৪	রাজার আক্ষেপ	৪৩
হরগৌরীর হিমালয় পরিত্যাগ	৮৩	বেদবতীর বনবাস	৪৯
অর্দ্ধনারীধর মূর্তি	৮৫	পকাশ অক্ষরে স্তব	৫৪
কাশী নির্গমন	৮৬	ভগবতীর অমুকম্পা	৫৭
তিলভাণ্ডেশ্বরের উপাখ্যান	৯০	বিদ্যাধরীর সহিত রাণীর কথা	৬১
		বজ্রালের জন্ম	৬৩
ষষ্ঠ পালারস্ত এবং মেনকার স্বপ্নে উমাদর্শন	৯২	বজ্রালের বিদ্যাভ্যাস	৬৫
হিমালয়ের কাশী প্রস্থান	৯৪	রাণীর বিরহ	৬৮

রাজার যজ্ঞারম্ভ	৭৩	রাজার প্রতি ভগবতীর প্রত্যাশ	১০৯
বৈদিক ব্রাহ্মণের আগমন	৭৫	ভগবতীর পূজা	১১০
কাশ্যকুন্ড্র দেশে ভাটের গমন	৭৬	রাণীর সহিত রাজার নিজদেশে গমন	১১১
পঞ্চব্রাহ্মণের আগমন	৮০	বড়রাণীগিণের সহিত আলাপ	১১২
যজ্ঞারম্ভ সভাবর্ণনা	৮২	যজ্ঞ সমাপ্ত	১১৩
বল্লালকর্তৃক পশুধারণ	৮৭	কৌজিস্থের নিরূপণ	১১৪
রাজার পরাভব ও পিতা পুত্রের যুদ্ধ	৯১	বারেস্তের কুল	১১৫
রাণীর বোদন	৯৯	কায়স্থের কুল	১১৬
রাজার চেতনা	১০২	রাণীর স্বর্গারোহণ	১১৭
রাণীর সহিত রাজার পরিচয়	১০৩	লক্ষণ সেনের জন্ম	১১৮
রাণীর আক্ষেপ উক্তি	১০৫	কায়স্থ ব্রাহ্মণের মিলিত সমাজ নিরূপণ	১২১
বারোমাস্তা কথন	১০৭		

আলোচ্য গ্রন্থখানির আখ্যাপত্র পাওয়া না গেলেও, গ্রন্থমধ্যে গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে। হু-একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি :—

(ক) অন্তর্যার পাদপাশ্রে মধু করি আশ।

রচিল শ্রীরামচন্দ্র গৌরীর বিলাস ॥ (১ম ভাগ, পৃ. ৩২)

(খ) গরিটী সমাজধাম গোপাল মুখটি নাম।

তার হৃত দ্বিজ রামধন।

তাহার তনয় তিন জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র দীন

গৌরীপুণ করিল রচন ॥ (১ম ভাগ, পৃ. ১১৩)

(গ) শ্রীকবি কেশরী নাম নিজ হরিনাভিধাম

শ্রীচূর্ণামঙ্গল রসগানে ॥ (২য় ভাগ, পৃ. ২)

গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের শেষে রচনাকাল ১৭৪১ শক (= ১৮১৯ সন) এই ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে :—

শশী ঋষি বেদশশী শকনর রায়।

সমাপ্ত হইল গ্রন্থ তারার ইচ্ছায়—

এই গ্রন্থ “শ্রীরামমোহন ধনীর” অর্থে মুদ্রিত। সমগ্র গ্রন্থ গীত হইবার উদ্দেশ্যে রচিত, ইহাতে রাগ-রাগিণী দেওয়া আছে। গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক বলিতেছেন :—

পুস্তক প্রাপ্ত করি ছিল অভিলাষ।

গায়ক দ্বারায় গীত করিব প্রকাশ ॥

অর্থ বিনা সে সকল না হয় পূর্ণিত।

শ্রীরামমোহন ধনী করিলেন হিত ॥

ছাপিলা পুস্তক করি নিজ অর্থব্যয়।

শ্রমসার্থকতা হয় শুণীগণে নয় ॥

নতুবা পাঠবে পুতি দশরা মসরা।

ভেড়ার শৃঙ্গেতে যেন হীরাধার জরা ॥

ধনী গুণী নিকটেতে প্রার্থনা আমার ।

গাথকের দ্বারে কেহ করিলে প্রচার ॥

অনুমতি রূপে নাম দিও স্থানে স্থানে ।

রাজা রঘুনাথ যথা আছে চণ্ডীগানে ॥

অন্নদামঙ্গল গানে কৃষ্ণচন্দ্র ভূপ ।

ভনিতার পূর্বে নাম দিবা সেইরূপ—

গ্রন্থখানি ১৮১৯ সনে রচিত হইবার অল্পদিন পরেই মুদ্রিত হয় বলিয়া মনে হইতেছে । গ্রন্থের শেষে “স্বাক্ষরকারিদিগের নাম”-এর মধ্যে নীলমণি মল্লিক ও রামমোহন রায়ের নাম পাইতেছি ; ১৮২১ সনে নীলমণি মল্লিক পরলোকগমন করেন, এবং ১৮৩০ সনে রামমোহন বিলাত যাত্রা করেন ।

‘গৌরীবিলাস’ ও তদন্তর্ভুক্ত ‘কঙ্কালীর অভিষাপ’ যে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল এ সংবাদ ইতিপূর্বে কাহারও জ্ঞান ছিল না । এই দুইখানি গ্রন্থের হাতে-লেখা পুথির কিছু খণ্ডিত অংশ ত্রীযুত নিত্যধন ভট্টাচার্য্য পাইয়াছেন । ১৩৪০ সালের ৩য় সংখ্যা ‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’য় তিনি ‘গৌরীবিলাস’ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন । তাঁহার সংগৃহীত পুথিতে ১৫-১৫, ১৭-১৮, ২৬-৩১ পত্রগুলি নাই বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন । সুতরাং ঐ সব স্থলের গল্পাংশের বর্ণনা তিনি দিতে পারেন নাই । আমরা মুদ্রিত গ্রন্থ হইতে সংক্ষেপে সেই সেই অংশে বর্ণিত বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি ।—

১৪-১৫ পত্র (মুদ্রিত গ্রন্থের ২৬-২৯ পৃঃ) ।

লক্ষ্মী কর্তৃক নারায়ণের গলে বরমালা দান ; দেবাসুরের পুনরায় সমুদ্র মন্থন ; অমৃতকুণ্ড লইয়া সমুদ্র হইতে ধ্বংসের উত্থান ; অসুরদের অমৃত গ্রহণে উদ্যোগ ; বিষ্ণু কর্তৃক মোহিনী স্ত্রীরূপ ধারণ এবং অসুরগণকে বধিত করিয়া দেবগণকে অমৃত দান ।

১৭-১৮ পত্র (মুদ্রিত গ্রন্থের ৩১-৩৫ পৃঃ) ।

শিব কর্তৃক কালকূট বিধ পান ; শিবের মুচ্ছা ; দেবতাদের ক্রন্দন ; শিবানীর স্তব করিবার জন্ত দেবগণকে বিষ্ণুর উপদেশ, দেবগণ কর্তৃক ব্রহ্মময়ী শিবানীর স্তব ; স্তবে প্রসন্ন হইয়া ক্ষীরোদ-তীরে তাঁহার আগমন ; শিবের চেতনা লাভ ; দেব ও অসুরগণের স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান ; সংক্ষেপে দক্ষযজ্ঞের বর্ণনা ।

২৬-৩১ পত্র (মুদ্রিত গ্রন্থের ৪৯-৬০ পৃঃ) ।

পিতামহের উপদেশে দেবগণ কর্তৃক মদনের আহ্বান ; শিবের ধ্যান ভঙ্গের জন্ত মদনকে শিবদমীপে প্রেরণ ; শিব কর্তৃক মদন ভঙ্গ ; রতি বিলাপ ; শিবের অন্তর্ধান ; হিমালয় কর্তৃক উমাকে গৃহে আনয়ন ; পিতা মাতাকে সান্ত্বনা করিয়া উমার তপস্তায় গমন ।

(২) দুর্গামঙ্গলাস্তর্গত নলদময়ন্তী । পৃ. সংখ্যা ৭৯ ।

শ্রীদুর্গাঃ ॥ শরণং ॥ শ্রীদুর্গামঙ্গলাস্তর্গত নলদময়ন্তী নামক গ্রন্থ/ত্রীযুত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের দ্বারা পদ্মাদি / ছন্দে বিরচিত হইয়া/শ্রীমাধবচন্দ্র ধর ও শ্রীকপটাদি দে / ইহারদিগের অনুমতানুসারে/ কলিকাতা / জ্ঞানগ্নন যন্ত্রে যন্ত্রিত হইল / এই পুস্তক বাহাদুরদিগের প্রয়োজন হইবেক তিনি / বটতলার দক্ষিণাংশে তত্ত্ব করিলে / পাইবেন ইতি ॥ সন ১২৩০ সাল তারিখ ১৩ কাশ্যপুর্ণিমা

এই পুস্তকের এক খণ্ড কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটিতে আছে।

দ্বিজ রামচন্দ্রের ‘নলদময়ন্তী’ শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় ১৩০৫ সালে ‘দুর্গামঙ্গল’ নামে প্রকাশ করেন। তিনি একখানি পুথি হইতে ইহা মুদ্রণ করেন; খুব সম্ভব এই পুথি মুদ্রিত পুস্তকের নকল। ‘নলদময়ন্তী’ যে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল, এ সংবাদ শাস্ত্রী মহাশয় জানিতেন না। তিনি তাঁহার পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, দ্বিজ রামচন্দ্র “সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রে নিপুণ ছিলেন; স্তবরাং এই কাব্যের অনেক স্থলে শ্রীহর্ষের নৈষধচরিতের অনুকরণ করিয়াছেন। যে যে স্থানে অবিকল নৈষধচরিতের ভাব অপহরণ করিয়াছেন...”

প্রকৃতপক্ষে ‘নলদময়ন্তী’র পূর্বেকার একটি মুদ্রিত সংস্করণের আখ্যাপত্রে নৈষধচরিতের উল্লেখ কবি নিজেই করিয়াছিলেন। বেহারিগোহন দাস নামে এক ব্যক্তি এই সংস্করণের ‘নলদময়ন্তী’ পুথির আকারে নকল করিয়া লইয়াছিলেন। মুন্সী আবদুল করিম এই পুথির উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বিবরণটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

২৪৯। নলদময়ন্তী। এই পাণ্ডুলিপিস্থানিও মুদ্রিত গ্রন্থ দেখিয়া প্রস্তুত। আদরণ পত্রে লেখা আছে:— হরিচরণ সার। নলদময়ন্তী। শ্রীশ্রী ৮ দুর্গামঙ্গলান্তর্গত নলদময়ন্তী উপাঙ্গণ অর্থাৎ নৈষধ কাব্য। তন্তু বা শ্রীযুত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের দ্বারায় পরামর্শাদি ছন্দে বিরচিত হইয়া শীবাচহ নিবাসী শ্রীগোরাচাঁদ শেন দীং শীন্দুযন্ত্রে মুদ্রাস্থিত হইল।...

স্বক্ষরমিদং শ্রীবেহারি মোহন দাসস্ত হক মালিক। এই পুস্তক শ্রীযুত পীতাম্বর বাবুর বাটীর মণ্ডপ ঘরে সন ১১৯৯ মঘিতে মাতাবেক সন ১২৪৪ বাদশাহ তারিখ ৫ চৈত্র রোজ শনিবার ৬ এ দণ্ড বেলা গতে লিখা সমাপ্ত হইল।...

ইহা হইতে আরও জানা গেল, ১৮৩৮ সনের কাছাকাছি ‘নলদময়ন্তী’র একটি সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল।

‘নলদময়ন্তী’র শেষে কবি ‘কঙ্কালীর অভিশাপের’ কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

নল দময়ন্তী কথা করিলে শ্রবণ।

কলির নাহিক ভয় পাগবিমোচন ॥

অতঃপর বসি কঙ্কালীর অভিশাপ।

রচিল শ্রীরামচন্দ্র সংগীত আপাণ ॥

এখানে একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ‘নলদময়ন্তী’ পুস্তকের আখ্যাপত্রে প্রকাশ যে ইহা “দুর্গামঙ্গলান্তর্গত”। প্রকৃতপক্ষে ‘গৌরীবিলাস’, ‘কঙ্কালীর অভিশাপ’ ও ‘নলদময়ন্তী’। এই তিনটি লইয়াই ‘দুর্গামঙ্গল’ পালা,—ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ের স্থায় ‘দুর্গামঙ্গল’ও কোন একখানি পুস্তক-বিশেষের নাম নহে। পরে দেখা যাইবে, কবি তাঁহার ‘হরপার্বতীমঙ্গলে’ ‘গৌরীবিলাসকে’ও ‘দুর্গামঙ্গল’ বলিয়াছেন।

(৩) অক্রুর সংবাদ। পৃ. ১১৬।

শ্রীশ্রীহরিঃ । / শরণং / শ্রীকৃষ্ণলীলায়ুত অক্রুর সংবাদ । / নমক গ্রন্থ ॥ / শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার কবি কেশরী কর্তৃক / শেষে গদ্য [পদ্য ?] রচিত অক্রুর সংবাদ / মথুরা লীলা । / ইদানীং / শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাসদেব

অমুমতানুসারে / কুমারটুলির শঙ্কর প্রকাশ যন্ত্রে যন্ত্রিত / হইল । / এই পুস্তক বাঁহাদিগের প্রয়োজন হইবেক তাহার / কলিকাতার / শোভাবাজারের বটতলার দক্ষিণাংশে/তত্ত্ব করিলে পাইবেন । / ইতি সন ১২৫৬ সাল তারিখ ৭ চৈত্র মাস । /

কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটিতে এক খণ্ড ‘অজুর সংবাদ’ আছে । পুস্তকের শেষে
রচনাকাল—১৭৪৫ শক (= ১৮২৩ সন) দেওয়া আছে :—

সাগরের পূর্ণশশী বাণ বেদ দশকে বসি

এই স্থানে গ্রন্থের বিশ্রাম ॥

(৪) আনন্দলহরী । ১৮২৪ । পৃ. সংখ্যা ৬২ ।

শ্রীশ্রীচূর্ণা ।— / জয়তি— / শিবাবতার শ্রীশঙ্করাচার্য্যানিজকৃত / আনন্দলহরী / শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারকৃত
স্তবীয়ার্থ সাধু / ভাষা সংগ্রহঃ / কলিকাতার কলুটোলার সমাচার / চন্দ্রিকাযন্ত্রে মুদ্রিত হইল / সন ১২৩১ সাল /

রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে । ইহাতে- রূপচাঁদ আচার্য্য-
ক্ষোদিত একখানি লাইন-এনগ্রেভিং আছে । পুস্তকের আরম্ভে গ্রন্থকার নিজ পরিচয়স্বরূপ
লিখিয়াছেন :—

হরিমাতি নিবাসী শ্রীরামচন্দ্র বিজ্ঞানজঃ ॥

আনন্দলহরী ভাষাং করোতি স্ববোধায় চ ॥ (পৃ. /০)

পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় :—

আনন্দলহরী স্তবমধু সরসিজ ॥

ভাষায় করিল ব্যাখ্যা রামচন্দ্রবিজ্ঞ ॥

ইন্দু ইন্দুপিতা বেদ বাণ পরিমাণ ।

এই শকে এই গ্রন্থ সমাপ্ত বিধান ॥ ১০২ ॥

ইতি আনন্দলহরী সমাপ্তঃ সন ১২৩০ শাল ॥

ভাদ্রিখ ২০ চৈত্র ॥

এখানে বলা প্রয়োজন, গ্রন্থকার হরিমাতি-নিবাসী রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার স্বতন্ত্র ব্যক্তি নহে,—
ইনিই কবিকেশরী রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার । ইহার প্রমাণ পরে পাওয়া যাইবে । জানা যাইতেছে,
কবির উপাধি প্রথমে “বিদ্যালঙ্কার” ছিল ।

(৫) মাধব মালতী । পৃ. সংখ্যা ১২২ ।

মাধব মালতী নামক গ্রন্থ । / শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারেণ বিরচিতং / ইদানীং / শ্রীগুরুচরণ ধরের কমলাশন
যন্ত্রে যন্ত্রিত হইল । / এই গ্রন্থ বাঁহাদিগের প্রয়োজন হইবেক তাহার / মোকাম কলিকাতার আহিরীটোলার শ্রীযুত বাবু
দুঃখি/রামদেব ১১২ নম্বরের বাটিতে তত্ত্ব/ করিলই পাইবেন ॥ / ইতি সন ১২৭৫ সাল তারিখ ১২ চৈত্র বোজ সোমবার ।

কবির শেষ-জীবন শোভাবাজার-রাজপরিবারের আশ্রয়ে কাটিয়াছিল । কালীকৃষ্ণ দেব
বাহাজুরের আদেশে তিনি এই কাব্যখানি রচনা করেন । কবি লিখিতেছেন :—

অথ গ্রন্থস্থচনা ।

পর্যায় ॥

মহারাজা নবকৃষ্ণ বিখ্যাত নগরী ।

তাহার বর্ণনা আমি কল্পে বা করি ॥

আরোপিত কথনের নাম হয় স্তব ।

যে সব বর্ণনা করে নহে অসম্ভব ॥

দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য লইলেন জয়া ।

সেইমত তাহার তবন্ত দেখি কল্প ॥

ভাঁর ছিল নবরত্ন ইহার সে রূপ ।

সভাস্থের বি বা কব নিজে বিদ্যাকুপ ॥

সাক্ষাৎ বরদাপুত্র নামে জগন্নাথ ।

তর্কপঞ্চাননরূপে ভুবনবিখ্যাত ॥

মহাকবি বাণেশ্বর নবের শঙ্কর ।
 বলরাম কামদেব আর গদাধর ।
 শিশুরাম পদপুরে স্মার্ত্ত কুপারাম ।
 শান্তিপুরে বাস গোসাই ভট্টাচার্য্য নাম ।
 এই নবরত্ন লঙ্ঘ্য সর্বদা আমোদ ।
 আপনি আছেন লক্ষ্মী কি কব সম্পদ ।
 মাস্তুর কি কব যার উজ্জ্বল পদ ।
 হুকুম আছিল যার করিবারে বধ ।
 বিলাতের বাদসাহ করিলে সম্মান ।
 গবর্ণরের ঘরে যিনি সদা চৌকী পান ।
 অধিকার হাতে গড় গঙ্গামণ্ডলাদি ।
 হেন জন নাহি ছিল হয় প্রতিবাদী ।

রূপের তুলনা নাই মানে গোপীপতি ।
 মুখ্য বিনা কর্ম নাই তাহার সম্ভতি ।
 তাঁর পুত্র বাহাদুর রাজা রাজকৃষ্ণ ।
 কি কব তাঁহার গুণ ন শ্রুত ন দৃষ্ট ।
 পিতাতুল্য মাছু নাম তাবত কপ্তেতে ।
 বিশেষ তাঁহার গুণ দয়ার ধর্মেতে ।
 দেবীর বস্ত্রালের যে বা ছিল ঘাটি ।
 কায়স্থের কুলের করিল পরিপাটি ।
 তাঁর পুত্র কালীকৃষ্ণ বাহাদুর নাম ।
 নবীম প্রবীণ যিনি সর্বগুণধাম ।
 আদ্যাশক্তি কমলার কবিত্ব বিশেষ ।
 কবি রামচন্দ্রে প্রতি করিল আদেশ ।

গ্রন্থশেষে কবি ‘মাধব মালতী’র রচনাকাল ১৭৫২ শক (= ১৮৩০ সন) এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন :—

চন্দ্র চন্দ্রবানি চন্দ্রললাটিবদন ।

চন্দ্রহাসবুদ্ধি যাতে শক দিরপণ ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাগারে এক খণ্ড ‘মাধব মালতী’ আছে ।

(৬) হরপার্বতীমঙ্গল । পৃ. ৩৩৯ ।

শ্রীশ্রীদুর্গা // জয়তি । / শ্রীহরপার্বতী মঙ্গল / মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের
 অমৃতমুসারে // তৎসভাসদ / শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার কবিকেশরী / ভট্টাচার্য্য কর্তৃক রচিত // বিচার
 করিবে গুণ গুণি বিজ্ঞবর । / খলের স্বভাব নোষ দেখিতে তৎপর // পদ্যবনে তাজি মধু মৃণাল ভুজঙ্গ । /
 ভেক ভঙ্কণের আশে তাহার আসঙ্গ // আহিরীটোলা নিবাসী । / শ্রীমাধবচন্দ্র ধর ও শ্রীরূপচাঁদ দেব জ্ঞানাজ্ঞান
 যন্ত্রে / মুদ্রাঙ্কিত হইল //[১২৫৮ সাল]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাগারে এক খণ্ড জীর্ণ ‘হরপার্বতীমঙ্গল’ আছে। আখ্যাপত্রে প্রকাশকালটি পড়া যাইতেছে না, কিন্তু ইহা যে ১২৫৮ সাল তাহাতে সন্দেহ নাই। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে এই সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক আছে। ইহাতে একখানি কাঠখোদাই চিত্র আছে।

এই মহাকাব্যখানিও কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের আদেশে রচিত। ‘হরপার্বতীমঙ্গল’ের আখ্যাপত্রে কবি নিজেকে কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের “সভাসদ” রূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

‘হরপার্বতীমঙ্গল’ে কবির “আত্মপরিচয়” অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

ত্রি পদী ॥

জাহ্নবীর পূর্বভাগ,

মেদনমল্ল অমুরাগ,

অধিপতি ছিল মদন রায় ।

নিজে মামারক গাজী,

আপনি হইয়া রাজী,

বনমাঝে দেখা দিলা তাঁর ॥

সঙ্গেতে সহায় হৈয়ে,

নবাবে স্বপন কৈয়ে,

সিরপা পাইল জমীদারী ।

দত্ত কুল সমুদ্রব, গোপীগতি খ্যাতি রব,
 কায়স্থ কুলের অধিকারী ।
 বৃত্তিভোগী কত বিজ, পঞ্চম তনয় নিজ,
 কনিষ্ঠ শ্রীরাম বিচক্ষণ ।
 বুঝিয়া কার্যের তত্ত্ব, জমীদারী তাহে বর্ত্ত,
 তদঙ্গঙ্গ শ্রীদুর্গাচরণ ॥
 সহায় আনন্দময়ী, সর্ব্বাংশে হইলা জয়ী,
 শ্রীমতী শ্রীমতী যার বাণী ।
 করিয়া সমাজস্থান কত ভূমি কৈলে দান,
 বারুইপুরেতে রাজধানী ॥
 তন্তু পুত্র গুণধাম, শ্রীকালীশঙ্কর নাম,
 অল্পকালে হৈলা লোকান্তর ।
 তন্তু পুত্র মহাশয়, শ্রীরাজবল্লভস্বয়ং,
 চৌধুরী বিখ্যাত সর্ব্বত্তর ॥
 শৌর্য্য বীৰ্য্য ধৈর্য্যবরা, অবিবাধে পালে ধরা,
 গান্ধীৰ্য্যতে রঘুপতি রাম ।
 অধিকার ইংরাজী, কেহ করি কারসাজী
 কিছু গ্রাম করায় নিলাম ॥
 তার মধ্যে বাসস্থান, হরিনাভি সমাধান,
 কিনিলেন দুর্গারাম কর ।
 নহেন সামান্য ব্যক্তি, গুরু দেব দ্বিজে ভক্তি,
 কীর্ত্তি কত দেশ দেশান্তর ॥
 উভয়ত গুণযোগী, কিন্তু যার বৃত্তিভোগী,
 আশীর্বাদ করি পুনঃ পুন ।
 করীন্দ্র মাতাম কুল, ইষ্ট যার অঙ্গকুল,
 পিতৃপরিচয় কিছু শুন ॥
 মুখটী বিখ্যাত কুলে, মেলবন্ধ যার ফুলে,
 শঙ্করের তনয় গোপাল ।
 ভরবাজ মূনি অংশ, কানাই ঠাকুর বংশ,
 আদান প্রদানে সম ভাল ॥
 তিনি কুল ভঙ্গ নিজ, মাহিনগরেতে দ্বিজ
 কামদেব সার্ব্বভৌমাখ্যান ।
 বিবাহ তনয়া তারি, তাহাতে সন্তান চারি,
 রামধন তৃতীয় সন্তান ॥
 তদঙ্গঙ্গ রামচন্দ্র, ইষ্ট চরণারবিন্দ,
 একান্ত হৃদয়মাঝে ভাবি ।
 বিনোদরাম স্ততঃস্তুত, রচিল বিনয়যুত,
 • সংপ্রতি নিবাস হরিনাভি ॥

উপরি উক্ত অংশের এক স্থলে কবি নিজেকে বিনোদরাম তর্কপঞ্চাননের “সুতাসুত” অর্থাৎ দৌহিত্র বলিতেছেন। শ্রীযুত নিত্যধন ভট্টাচার্য্য কবির মাতামহকুলের যে পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা নির্ভুল নহে বলিয়াই মনে হইতেছে।

কবি বাকুইপুরের রাজবল্লভের আদেশে ‘হরপার্বতীমঙ্গল’ রচনা করিয়াছিলেন; তিনি লিখিয়াছেন :—

বারুইপুরেতে বাস, শ্রীরাজবল্লভ দাস,
আদেশিল রচিত্তে মঙ্গল।
রামচন্দ্র বিরচিত্তে, শ্রীহরপার্বতী গীত,
নায়কেরে করিলে কুশল ॥

‘হরপার্বতীমঙ্গল’র এক স্থানে কবি ‘হর্গামঙ্গল’র বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করিয়াছেন। এই অংশটি উক্ত করিতেছি :—

অতঃপর যে যে কথা, শ্রীহর্গামঙ্গল যথা,
করিয়াছি তাহাতে রচনা।
হিমালয়ে সতীর জন্ম, কামদেব ভ্রম্য কর্ণ,
পার্বতীর শিব আরাধনা ॥
মিলন হইল উভে, হরগৌরী বিভা শুভে,
উভয়ের কাশীতে প্রস্থান।
গিরি ঘরে গৌরী আনি, আসিয়া পিনাকপানি,
কৈলাসশিখরে শেষে যান ॥
স্তব কৈল দিবিন্দ, তারকাহরের বধ,
গণেশ কার্ত্তিক জন্মাইয়া।
বিরচিত রামচন্দ্র, অশেষ প্রকার ছন্দ,
দেখিবেন উভে মিলাইয়া। (পৃ. ৬১-৬২)

(৭) শাতাতপীয় কর্মবিপাক।

পাদরি লঙ্ঘের মতে ১৮২০ সনে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে পরবর্তী সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক আছে, তাহার আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ। / শরণং / শাতাতপীয় কর্মবিপাক। / অর্থাৎ / শাতাতপ মুনিকর্তৃক সংগ্রহ / মহাপাপ ও অতিপাপ / ও সামান্য পাপকারি মনুষ্যদিগের/জন্ম জন্মান্তরে তৎপাপ চিহ্ন যে সকল রোগ / উদ্ভব হয় তাহার প্রায়শ্চিত্ত/বিবরণ। / তত্ত্বার্থ / শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের দ্বারা / সংগৃহীত হইয়া। / ইন্দ্রানী / শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্মকারের অনুমতানুসারে / শ্রীরামপুর / জ্ঞানারণোদয় যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল। / শকাব্দা ১৭৭৩ / [পৃ. সংখ্যা ৩১]

উক্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরিতেও এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে।

(৮) কোঁতুকসর্বদ্বন্দ্ব নাটক। ১৮২৮। পৃ. ৭৮।

ব্রিটিশ মিউজিয়মে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে। মিউজিয়মের পুস্তক-তালিকায় ইহার এইরূপ বর্ণনা আছে :—

GOPINATHA CHAKRAVARTI. ষোড়শ সর্গের নাটক ॥ শ্রীযুক্ত কলিবাংসল রাজার উপাখ্যান ॥
[*Kautukasarvasva nataka*. A Sanskrit play, with intervening portions appearing
in a Bengali version in prose and verse by Ramachandra Tarkalankara.] pp. 78.
১২৩২ [Calcutta ? 1828.] ৪°.

পাদরি লেগের বাংলা পুস্তকের তালিকাতেও (পৃ. ৭৫) পাইতেছি :—

Kautuk Sarbasa Natak, Ch. P., 1830, a drama, by R. Chundra Tarkalankar
of Harinabhi.

(৯) চন্দ্রবংশ ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাগারে আখ্যাপত্রবিহীন এক খণ্ড ‘চন্দ্রবংশ’ আছে ; তাহার পৃ.
সংখ্যা ৪ + ১৪৪ । এই পুস্তকের রচনাকাল ১৭৫০ শক (= ১৮২৮ সন) শেষ পৃষ্ঠায় এই ভাবে
দেওয়া আছে :—

শুন ভাই পুণ্যবান ভারতের উপাখ্যান
রসিকজনের রসলভ্য ।
মৈত্র বাণ শৃঙ্গ ডাকে সমাপন ঐ শাকে
কহে রামচন্দ্র কবিসভা ॥

গ্রন্থচন্দ্রায় কবি তাঁহার বংশ-পরিচয় দিয়াছেন ; এই অংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

মুখচী বিখ্যাত কুলে মেলি বন্ধ যার ফুলে
ছোট্ট ঠাকুর কানাই আছিল ।
গঙ্গানন্দে কৈলা জাগ ছলে কত্যা নিয়া দান
সারুণ্য তাহাকে পদ দিলা ॥
কি আর বিস্তর কব তন্তু বংশে সমুত্তর
মুখচী গোপাল ভদ্র নিজ ।
তন্তু পুত্র রামধন দৌহিত্র যার হন
কামদেব সাব ভৌম দ্বিজ ॥
রামধন স্ত্রী তিন জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র দীন
বিনদ্রাম তনয়া নন্দন ।
নিবসতি হরিনাভি উমা পাদপদ্ম ভাবি
কাব্য কিছু কহিব বচন ॥

ইহার পর কবি এই গ্রন্থ-রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

শুন ভাই সর্বজন চন্দ্র বংশ বিবরণ
সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলি সার ।
নষ্টবের অবতরণে জগ যার চন্দ্রবংশে
যথাতি ভূপতি নাম যার ।
কব কাব্য আদারস বাহাতে রসিক বশ
কাল গুণে আদর অধিক ।
ভক্তি মুক্তি রসপ্রতি অনেকে না লয় মতি
দেখিলাম প্রায় চারি দিক ॥

কিন্তু পূর্ব কবি যারা

প্রকাশ করেছে তারা

আমি রস সংস্কৃতে গুপ্ত।

সাহিত্য নাটক যত

প্রায় হইয়াছে হত

ইতে সংস্কৃত রস লুপ্ত।

ভাষায় কিঞ্চিৎ করা

অনেকের মন হয়

গুণি জনে না ধরিবে দোষ।

দ্বিজ রামচন্দ্র কয়

যদ্যপি অগ্রাহ্য হয়

বিচক্ষণে পাইবে সন্তোষ।

ইণ্ডিয়া অফিস নাইত্রেরিতে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে। তাহার প্রকাশকাল ১৮৪১ সন ;
পৃ. সংখ্যা ৪ + ১২০।

(১০) আচার-রত্নাকর। ১৮৪১।

এই পুস্তকখানি সম্বন্ধে মুন্সী আবদুল করিম লিখিয়াছেন :—

৪৩১। আচার-রত্নাকর। ছাপা গ্রন্থ। ইহাতে অরুণোদয় হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত সময়ের কর্তব্য সঙ্গতর
কথিত হইয়াছে। আবার লেখা আছে :—“শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া ইমানীং শিবানহের
শ্রীপীতাম্বর সেন দীং সিন্ধু যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। সন ১২৪৮ সাল। (‘বাম্বালা প্রাচীন পুথির বিবরণ’,
১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃ. ২৬৮)

(১১) কালীপুরাণ। ১৮৪৮। পৃ. সংখ্যা ৪ + ২৭৫।

শ্রীশ্রীচূর্ণা / শরৎ / মূল কালীপুরাণ। / অর্থাৎ / কামাখ্যা বর্ণন এবং ভগবতী পূজা ইত্যাদি / বহুবিধ
প্রকরণ আছে। / বক্তা মহামুনি ঔরব গোস্বামী। / শ্রোতা সূর্যবংশোদ্ভব সগর রাজা। / ভক্তা / শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র
তর্কালঙ্কার কর্তৃক / বিরচিত হইয়া / শ্রীমধুরত্ন ভট্টাচার্য্য ও শ্রীকালীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের / কলিকাতা / সারসংগ্রহ
যন্ত্রাঙ্কৈশু স্জিতা। / এই পুস্তক বাঁহারদিগের প্রয়োজন হইবেক মোং / শোভাবাজারের বটভলার উত্তরাংশে উক্ত
যন্ত্রালয়ে / পাইবেন ইতি / সন ১২৫৫ সাল। /

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাগারে এক খণ্ড ‘কালীপুরাণ’ আছে। গ্রন্থশেষে ইহার রচনাকাল
১৭৫৬ শক (= ১৮৩৪ সন) এই ভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে :—

সমাপ্ত হইল গ্রন্থ ব্যাসের বচন।

ভাষা করি রামচন্দ্র করিল রচন।

মুখটি বিখ্যাত কুলে হরিনাভী বাস।

পয়ার প্রবন্ধে রচি ব্যাসের আভাষ।

রসবাণ সমুদ্র পশ্চাত হৃদাকর।

সমাপ্ত হইল গ্রন্থ শক নৃপবর।

গ্রন্থান্তে কবি আত্মপরিচয় দিয়া তাঁহার পূর্ববর্তী রচনাগুলির উল্লেখ করিয়াছেন, তৎপরে
শোভাবাজার-রাজবংশের পরিচয় দিয়া জানাইয়াছেন যে, এই গ্রন্থও কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের আদেশে
রচিত। আমরা এই অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

নিবাস জাহ্নবী তীর হরিনাভী গ্রাম ।
 সমাজ কায়স্থ দ্বিজ কত কব নাম ॥
 মেলি বন্ধ ফুলেতে মুখুটি অবদাত ।
 অধুনা উপাধি তর্কালঙ্কার বিখ্যাত ॥
 পূর্বের কয়খানি গ্রন্থ করেছি রচনা ।
 বহু রস বহু ছন্দে তাহার সূচনা ॥
 গৌরীর বিলাস নল দময়ন্তী কথা ।
 মাধব মালতী চন্দ্র বংশোদয় গীতা ॥
 কৌতুক সর্বস্ব হরপার্বতী মঙ্গল ।
 আনন্দলহরী ভাষা আচার সকল ॥
 কর্ম বিবেকার্থ আর আছয়ে অনেক ।
 অক্রুর সম্বাদ বধী সিতলা কতেক ॥
 করেছি অমর ভাষা শব্দ অনুমান ।
 সংপ্রতি রচিব ভাষা কালীকা পুরাণ ॥
 বিক্রমআদিত্য তুল্য নবকুসরাজ ।
 নবরত্ন সম যার পণ্ডিত সমাজ ॥
 তাহার তনয় রাজকুণ্ড বাহাদুর ।
 রূপে গুণে দয়া ধর্মে ভাবতে প্রচুর ॥
 তাহার তনয় অষ্ট সবে বিলক্ষণ ।
 শিবকুণ্ড জ্যোত্স্ন সর্ব হলক্ষণ ।
 কালীকুণ্ড মধ্যম বর্ণনে বর্ণ হারে ।
 শাপে হুয়পতি অবতীর্ণ এ সংসারে ॥
 শান্ত ধীর দেবীকুণ্ড নামেতে তৃতীয় ।
 চতুর্থ অপূর্বকুণ্ড সর্বজনপ্রিয় ॥

পঞ্চম মাধবকুণ্ড বিজ্ঞ গুণবান ।
 ত্রীনৃপেন্দ্রকুণ্ড ষষ্ঠ উপেন্দ্র সমান ॥
 সপ্তম নরেন্দ্রকুণ্ড মদন যুগতি ।
 বাদবেন্দ্রকুণ্ড নাম অষ্টম সমুত্তি ॥
 কৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণসখ দেওয়ান বাটীর ।
 সমস্পর্ক ভাগিনেয় বিচক্ষণ ধীর ॥
 বৃহস্পতিতুলা সভাপণ্ডিত শ্রীকান্ত ।
 মধ্যমের গুণ বলি ধীর দয়া শান্ত ॥
 হুশীল পণ্ডিত হুকুমার অনুপম ।
 ক্ষমা ধৈর্য্য দয়ালীল ধার্মিক উত্তম ॥
 সভাসত রামচন্দ্র আচ্ছা দিল ভারে ।
 কালিকা পূরণ ভাষা গীত রচিবারে ॥
 সেই বাক্য অনুসারে হইল রচিত ।
 সম্প্রতি ছাপায় গ্রন্থ হইবে মুদ্রিত ॥
 রচিব মানস আরো যদি আয়ু পাই ।
 নিবেদন মাগি কিছু সাধুজন ঠাই ।
 কিবল পয়ারছন্দে রচিত প্রচুর ।
 অত্র ছন্দে রচিলে ভাবার্থ হয় দূর ।
 এই হেতু বথার্থ মূল্যের সহ ঐক্য ।
 রচিয়াছি বিজ্ঞগণে করিবে কটাক্ষ ॥
 যদি তায় থাকে দোষ কর মোরে ক্ষম ।
 আছয়ে শাস্ত্রের কথা মুনি মতিভ্রম ॥
 অতএব কর কৃপা কটাক্ষাবলোকন ।
 কবি রামচন্দ্রে এই বরে নিবেদন ॥

উপরের উদ্ধৃত অংশে কবি তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা প্রদান করিয়াছেন ।
 তন্মধ্যে ‘গৌরীবিলাস’ হইতে ‘অক্রুরসংবাদ’ পর্যন্ত গ্রন্থের নাম ছাড়া বধী ও শীতলা সম্বন্ধেও
 গ্রন্থরচনার আভাস পাওয়া যাইতেছে ; বোধ হয় ইহা বধীমঙ্গল ও শীতলামঙ্গল হইতে পারে ।
 তন্নিম্ন ‘অমরভাষা’ বা অমরকোষের অনুবাদও তিনি করিয়াছিলেন । এতদ্ভিন্ন আয়ুতে কুলাইলে
 অত্রাশ্র গ্রন্থ রচনা করিতেও তাঁহার বাসনা ছিল দেখা যাইতেছে । কিন্তু ‘কালীপুরাণ’ের পরে তিনি
 অত্র কোনও গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন কি না, সে-সম্বন্ধে কোন সংবাদ এ যাবৎ আমরা সংগ্রহ করিতে
 পারি নাই ।

উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরিতেও এক খণ্ড ‘কালীপুরাণ’ আছে, তাহার প্রকাশকাল
 ১২৬২ সাল ।

‘কৌতুকসর্বস্ব’ ও ‘আচার-রত্নাকরে’র কথা বাদ দিলে, কবির প্রায় সকল গ্রন্থই আমার
 দেখিবার সুবিধা হইয়াছে ; কিন্তু ‘গৌরীবিলাস’ ও ‘আনন্দলহরী’ ছাড়া সেগুলি মূল সংস্করণের

পুস্তক নহে—কবির মৃত্যুর * পর প্রকাশিত প্রধানতঃ বটতলার সংস্করণ। এই কারণে সেগুলির সাহায্যে প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল পাইবার উপায় নাই।† তবে ‘নলদময়ন্তী,’ ‘কর্মবিপাক’ ও ‘চন্দ্রবংশ’ যে ১৮৩০ সনের পূর্বেই প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ১৮২৯ সনে মুদ্রিত পুস্তকাবলীর তালিকায় এই তিনখানি পুস্তক পীতাম্বর সেনের যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত বলিয়া সংবাদপত্রে উল্লেখ আছে।‡

দ্রষ্টব্য

এই প্রবন্ধের অধিকাংশ মুদ্রিত হইয়া যাইবার পর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাগারে রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের এক খণ্ড ‘নলদময়ন্তী’ পাওয়া গিয়াছে। ইহা ১২৩৪ সালে (১৮২৭ সনে) প্রকাশিত সংস্করণের পুস্তক। ইহার আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

শ্রীশ্রীপরমেশ্বর / শরণং । / নলদময়ন্তী উপাখ্যান । / অর্থাৎ / শ্রীযুক্ত নলরাজার কলি কত্রিক অক্ষত্রীড়া দ্বারা রাজ্যশূন্য / এবং / কলিপরিত্যাগানন্তর পুনঃরাজ্যাভিষিক্ত । / কলিকাতা । / মহেন্দ্রলাল প্রেমে ছাপা হইল, নম্বর ২৭, শাখারিটোলা / ১২৩৪ / [পৃ. সংখ্যা ২+৯২]

এই ‘নলদময়ন্তী’খানি প্রথম সংস্করণের পুস্তক বলিয়াই মনে হইতেছে।§

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

* ইং ১৮৪৫ সালের ১৬ই জুন তারিখ দেওয়া একখানি দরখাস্ত দেখিলাম। রামচন্দ্র তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্যের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার প্রথমা পত্নী গৌরীমণি দেবী ও তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র (মাধবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র) দ্বারিকানাথ মিলিয়া তাঁহার সম্পত্তির অধিকার পাইবার জন্ত এই দরখাস্ত করেন; হতরাত্ত বুরা বায়, ইং ১৮৪৫ (বাং ১২৫২) সালের কাছাকাছি সময়ে রামচন্দ্র দ্বারা যান।—“রামচন্দ্র কবিকেশরী বা দ্বিজ রামচন্দ্র”—শ্রীনিত্যধন ভট্টাচার্য। ‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’, ৩য় সংখ্যা, ১৩৪০, পৃ. ১১৪।

† মুনসী শ্রীআবদুল করিম ‘বাস্তালা প্রাচীন পুথির বিবরণে’ (১ম খণ্ড, পৃ. ৯৫-৯৬) ‘মাধব মালতী’র একখানি পুথির সন্ধান দিয়াছেন।

‡ ‘সংবাদপত্রে সেকালের কথা,’ ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৫।

§ ১৩৪৪।২৭এ আষাঢ়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

“বঙ্গভাষায় রচিত প্রথম ইংরাজী ব্যাকরণ”

(আলোচনা)

এই নামে একটি প্রবন্ধ ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ৪র্থ সংখ্যা ‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’য় প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য এই প্রবন্ধে ১৮১৬ সনে রামচন্দ্র-বিরচিত ‘বঙ্গভাষায় প্রকাশিত ‘ইঙ্গলিষ দর্পণ’ নামক ইংরেজী ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

(১) গ্রন্থকারের নাম শ্রীরামচন্দ্র। তাঁহার উপাধি কি ছিল, জানা যায় নাই ;

(২) রামচন্দ্র... “ইঙ্গলিষাঙ্গাভিলাসি বঙ্গদেশনিবাসি মহাশয়েরদিগের অনায়াসে ঐ শাস্ত্রের রীত্যবধারণ করণ” ইংরাজী ব্যাকরণ বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম প্রকাশ করেন।

লেখকের এই দুইটি উক্তি সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে ; সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি।

(১) ‘ইঙ্গলিষ দর্পণ’-রচয়িতা “রামচন্দ্র” কে ছিলেন, তাঁহার উপাধিই বা কি ছিল, তাহা নির্ণয় করা কঠিন নহে। পুস্তকের ভূমিকায় তিনি লিখিতেছেন :—

শ্রীযুত কাম্পেনী বাহাদুরের সম্পর্কীয় কার্য্য নচিব বিবিধবিদ্যানিধান শ্রীমান জন মাস্টার John Master. সাহেবের উপদেশক্রমে সেই ভূপাল চূড়ামণির সামান্য দণ্ড ভেদ ইত্যাদি যন্ত্র নিশ্চাপের আবশ্যনাম্যক নানাশাস্ত্র বিশারদ বিশ্বকর্ম্মী শ্রীযুত ডাক্তার বিলেম কেরী Dr. W. Carey. সাহেবের প্রধান সর্বাধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালয়কারের অনুসেবক শ্রীরামসেবক কর্তৃক দ্রুত ইঙ্গলিষবিদ্যা সামীপ্যাকারক ইঙ্গলিষ দর্পণ নামে দূরদর্শক অর্থাৎ দূরবীন নির্মিত হইল—

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালয়কারের “অনুসেবক” রামচন্দ্র ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের সহকারী পণ্ডিত রামচন্দ্র রায়। এই কলেজের বাংলা-বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন ডাক্তার উইলিয়ম কেরী এবং প্রধান পণ্ডিত ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালয়কার।* রামচন্দ্র রায় ১৮০৩ হইতে ১৮১৬ সন পর্য্যন্ত মৃত্যুঞ্জয়ের অধীনে কাজ করিয়াছিলেন। ১৮১৯ সনে প্রকাশিত রোবাকের (Roebuck-এর) *The Annals of the College of Fort William* পুস্তকের পরিশিষ্টে (পৃ. ৫০) বাংলা বিভাগের পণ্ডিতগণের মধ্যে রামচন্দ্র রায়ের নাম আছে, এবং তিনি যে ১৮০৩ সনে কলেজে পণ্ডিতী কর্ম্মে প্রথম বাহাল হন, তাহারও উল্লেখ আছে।

জন্ম মাস্টারের উপদেশক্রমে রামচন্দ্র ‘ইঙ্গলিষ দর্পণ’ রচনা করেন। এই জন্ম মাস্টার এক জন সিভিলিয়ান ; দেশীয় ভাষা—বিশেষতঃ বাংলা শিখিবার জন্য ১৮১৩ সনের ২০ নবেম্বর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রবেশ করেন এবং পর-বৎসর জুন মাসে কলেজ ত্যাগ করেন।† খুব সম্ভব, রামচন্দ্র তাঁহাকে বাংলা পড়াইয়াছিলেন।

* বাগবাজারে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালয়কারের চতুষ্পাঠী ছিল ; সেখানে ১৫ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিত।—William Ward : *A View of the History, Literature, and Mythology of the Hindoos*, lv. 495 (3rd ed., 1826.)

† Roebuck : *Annals of the College of Fort William*, Appendix, p. 68.

এই সকল কারণে রামচন্দ্র রায়কেই ‘ইঙ্গলিষ দর্পণ’কার বলিয়া আমি মনে করি।

(২) ১৮১৬ সনে প্রকাশিত রামচন্দ্রের ‘ইঙ্গলিষ দর্পণ’ই যে বাংলা ভাষায় “প্রথম” ইংরেজী ব্যাকরণ, এ কথা জোর করিয়া বলা যায় না ; কারণ, ঠিক এই বৎসরেই গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য-রচিত আর একখানি ইংরেজী ব্যাকরণ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল। গঙ্গাকিশোরের ব্যাকরণের এক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাগারে আছে। আমি তাহার আখ্যাপত্রটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

A / Grammar, / in / English and Bengalee : / containing / what is necessary to the knowledge / of the / English Tongue. / To which is added / a / Translation of Words / from / one to three Syllables, / laid down in a plain and familiar way. / By Gungakissore, Bhutachargee, / Calcutta : / From the Press of Ferris and Co. / 1816. / [পৃ. সংখ্যা ২১৬]

এই ইংরেজী ব্যাকরণ বাংলায় প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে গঙ্গাকিশোর লিখিতেছেন :—

শ্রীশ্রীদুর্গা

প্রভুলকত্রী

এতদেশীয় প্রায় অনেক বালকগণ ইংরাজী ব্যাকরণ পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়া অত্যন্ত কাল পরে তাঁহারদিগের উহাতে অলস তাচ্ছল্য এবং অশ্রেক্ষা জন্মে তাহার কারণ এই অভিশ্রাব হয় যে বালকত্ব ধর্ম হেতু তাঁহারদিগের বুদ্ধির তরলতা প্রযুক্ত ও মনের চঞ্চলতা প্রযুক্ত ঐ ব্যাকরণের যে পাঠ তাঁহারদিগের গুরু ও বন্ধু জনেরা দেন তাহা মৌনে রাখিতে পারেন না অতএব স্তবরাং তাঁহারদিগের অলসাদি জন্মাইতে পারে যেহেতুক মনুষ্যেরদিগের মন যে বিষয় কঠিন এবং শ্রম সাধ্য হয় তাহাতে অক্লেশে প্রবিষ্ট হয় না বিশেষত বালকগণদিগের অতএব আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে ইংরাজী ব্যাকরণের অর্থ আমারদিগের আপনার ভাষাতে সংগ্রহ থাকিলে যে সকল বালকেরা ইংরাজী ব্যাকরণ পাঠ করিতে বাঞ্ছা করিবেন তাঁহারদিগের অতি সুসাধ্য হইতে পারে একারণ যথাসাধ্য এক সংক্ষেপ ইংরাজী ব্যাকরণের অর্থ আমারদিগের সাধু ভাষাতে সংগ্রহ করা গেল...।

শ্রীযুত গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যোন

পরোপকৃত্যে কৃতঃ—

দেখা গেল, ১৮১৬ সনে বাংলা ভাষায় দুইখানি ইংরেজী ব্যাকরণ প্রকাশিত হইয়াছিল ; তবে কোনখানি আগে এবং কোনখানি পরে, তাহা আপাততঃ জোর করিয়া বলা যাইতেছে না।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাহিত্য-বার্তা

যে জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষৎগ্রন্থাবলী ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় সাধারণতঃ প্রকাশিত হয়। থাকে, মৌলিক আলোচনার নিদর্শন-সংবলিত ও বঙ্গভাষায় নানা স্থানে প্রকাশিত সেই জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ, তথা বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত বঙ্গভাষা ও সাহিত্যাদিবিষয়ক সেই জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার 'সাহিত্য-বার্তা' অংশে প্রতি তিন মাস অন্তর প্রকাশিত হইবে। এই অংশকে পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তৃত করিবার জন্ত—ইহাকে বাঙ্গালা ভাষার সমসাময়িক মৌলিক আলোচনার নিখুঁত ইতিবৃত্ত করিয়া তুলিবার জন্ত সাহিত্যিকবর্গের সহযোগিতা ও সাহায্য বিশেষভাবে প্রার্থনা করা যাইতেছে।—
পত্রিকাধক্ষক।]

সাহিত্য

গ্রন্থ

তারিণীচরণ মিত্র—ওরিয়েন্টাল ফেবুলিষ্ট। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত তারিণী-চরণ মিত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহ। ছাত্রাপ্য গ্রন্থমালা—৫। রজন পার্লিশিং হাউস, ২৫১২, মোহন-বাগান রো, কলিকাতা।

১৮০৩ সালে জন গিলক্রিস্টের তত্ত্বাবধানে 'ওরিয়েন্টাল ফেবুলিষ্ট' নামে হিন্দুস্থানী প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত ও রোমান অক্ষরে প্রকাশিত কতগুলি গল্পের বঙ্গানুবাদ অংশের বঙ্গাক্ষরে পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ।

বি. ভি. দাসগুপ্ত—Govinda's Kadcha : A Black Forgery. ১০, দোলাইগঞ্জ ষ্টেশন রোড হইতে এম. এন. দাসগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত।

গোবিন্দ কৰ্মকারের নামে প্রচলিত গোবিন্দদাসের কড়চা নামক গ্রন্থের অবগীচীনতা ও কৃত্রিমতা প্রদর্শন।

প্রবন্ধ

শ্রীহেমন্তকুমার ভট্টাচার্য্য—সংস্কৃত সাহিত্য ও কাব্যপ্রকাশ। বঙ্গশ্রী, চৈত্র '৪৩, পৃ: ৩৬৯.

৩৭৪।

কাব্যপ্রকাশ নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত অলঙ্কার-গ্রন্থের প্রতি উল্লাসের সংক্ষিপ্তসার।

শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য্য—চণ্ডীদাসের কথা। বঙ্গশ্রী, ফাল্গুন '৪৩, পৃ: ১৮৮-৯২।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামক গ্রন্থের অসারতা ও অবগীচীনতা প্রতিপাদন।

শ্রীমতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য—মঙ্গলোদয়। প্রবর্তক, চৈত্র '৪৩, পৃ: ৬০৪-৫।

[বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস প্রবন্ধে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (৪২৭) উল্লিখিত]

১২৬৯ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত মঙ্গলোদয় নামক সাপ্তাহিক পত্রের ১৪শ সংখ্যার বিবরণ।

শ্রীপ্রসাদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—অন্ধ কবি ৬কেনারাম নন্দী। প্রবর্তক, চৈত্র '৪৩, পৃ:

৬৪৮-৯।

শতবর্ষ পূর্বে শ্রীরামপুরের অন্তর্গত চাতরা নামক স্থানে প্রাহুত কেনারামের কবিত্বের পরিচয়।

শ্রীপুলিনবিহারী ভট্টাচার্য্য—শিলচর নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে সংরক্ষিত হস্ত-লিখিত পুথির তালিকা।

শিক্ষাসেবক, মাঘ '৪৩, পৃ: ১০১-১২।

বিষয়বিভাগানুসারে সজ্জিত বাংলা ও সংস্কৃত পুঁথিগুলির তালিকা ও স্থলবিশেষে অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

শ্রীমলিনীনাথ দাশগুপ্ত—তামাকুমাছায়া। ভারতবর্ষ, মাঘ '৪৩, পৃঃ ২৭৮-২৮১।

রামপ্রসাদ নামক এক কবির রচিত তাম্রকূটের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্যের বিবরণাত্মক ক্ষুদ্র বাংলা কাব্যের ১২০৮ মনে লিখিত পুঁথির সংস্করণ।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—যুতাজয় বিদ্যালঙ্কারের জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী। শনিবারের চিঠি, মাঘ '৪৩, পৃঃ ৫৩৭-৬৬।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—তারিণীচরণ মিত্রের জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী। শনিবারের চিঠি, ফাল্গুন '৪৩, পৃঃ ৬৯১-৯৯।

শ্রীআশুতোষ ঘোষ—টেকনিকের অনুরূপ বাঙ্গালা। ভারতবর্ষ, ফাল্গুন '৪৩, পৃঃ ৪২২-৩।

টেকনিক শব্দের তাৎপৰ্য্য নির্দেশপূৰ্ব্বক সম্পাদনা-শিল্প এই বাংলারূপ নির্ধারণ।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ—রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর। ভারতবর্ষ, চৈত্র '৪৩, পৃঃ ৬৩১-৫।

ঊনবিংশ শতাব্দীর এসিস্টে সাহিত্যিক কলিকাতা শোভারাজ্যের কালীকৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত জীবনকৃত।

এম. আশরাফ হোসেন—শ্রীহট্টের নাগরী সাহিত্য। শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৯৭৯-৮, ১১৮-২৫।

সিলেটী নাগরীতে প্রচারিত সাহিত্যের লেখকগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য—স্রীশিক্ষা বিধায়ক। শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৯০০-১১১।

ঐযীশ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রকাশিত ও তৎকালে সমাদৃত এই পুস্তকের বিস্তৃত পরিচয়।

ইতিহাস

প্রবন্ধ

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী—ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাগৈতিহাসিক যুগ। ভারতবর্ষ, মাঘ '৪৩, পৃঃ ২৮৬-৮।

সঙ্গীতের উৎপত্তিসম্বন্ধে ভারতীয় মত নির্দেশ ও সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রবর্তক ভারতের মতানুসারে শাস্ত্রদেব কর্তৃক রচিত অর্বাচীন গ্রন্থ 'সঙ্গীতরত্নাকর'র পরিচয়।

শ্রীধামিনীকান্ত সেন—ভারতীয় চিত্রকলার দ্বৈতরূপ। ভারতবর্ষ, মাঘ '৪৩, পৃঃ ২৩২-৪০।

ভারতীয় চিত্রকলায় স্বাভাবিকতার নিদর্শন নিরূপণ।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বসু—মালদহে দ্বিতীয় গোপালদেবের তাম্রশাসন আবিষ্কার। ভারতবর্ষ, চৈত্র '৪৩, পৃঃ ৬৩৮-৪০।

মালদহের জাজিলপাড়া গ্রামে নুবা বিষ্ণুত এই তাম্রশাসনের পরিচয়।

মুহম্মদ এনামুল হক—বঙ্গে ইসলাম বিস্তার। মাসিক মোহাম্মদী, মাঘ '৪৩, পৃঃ ২৬৩-৭০, ফাল্গুন '৪৩, পৃঃ ৩২১-৮।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত যে সমস্ত ধর্মপ্রচারক বাংলায় ইসলাম প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিবরণ।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ—পিতাপুত্র । প্রবাসী, মাঘ '৪৩, পৃঃ ৫০৯-১৮ ।

বাটোয়ারার পর হইতে বিষয় সম্পত্তি ও দেনাপাওনা সম্বন্ধে রামকান্ত রায় ও জগমোহন রায় যে রামমোহন রায় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ছিলেন, সরকারী চিঠিপত্র, জগমোহন রায়ের দস্তখত চিঠিপত্র এবং অন্তঃস্থ দলিলপত্র সাহায্যে তাহা প্রতিপাদন ।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ—নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার । প্রবাসী, ফাল্গুন '৪৩, পৃঃ ৬৮৪-৯২ ।

নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার ওরফে হরিহরানন্দনাথের সহিত রামমোহন রায়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিবরণ ।

শ্রীঅম্বোধানাথ বিদ্যাবিনোদ—মহারাজ দিব্য । প্রবাসী, চৈত্র '৪৩, পৃঃ ৮৩৭-৪৩ ।

বঙ্গের পালবংশীয় রাজা মহীপালের সময় আবির্ভূত দিব্য বা দিব্যোক্তের পরিচয় ও কৃত কার্যের বিবরণ ।

শ্রীমনোমোহন বোষ—দাবা খেলার ইতিহাস । বঙ্গশ্রী, ফাল্গুন '৪৩, পৃঃ ২২৭-৩২ ।

'চতুরঙ্গদীপিকা' নামক সদ্যঃপ্রকাশিত গ্রন্থ অবলম্বনে চতুরঙ্গকীড়ার বিবরণ ও ইহা হইতে বিভিন্ন দাবা-খেলার উৎপত্তি আলোচনা ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন—প্রাচীন ভারতে ব্যবহারশাস্ত্র । ভারতবর্ষ, মাঘ '৪৩, পৃঃ ১৭৭-৮১ ;

ফাল্গুন '৪৩, পৃঃ ৩৭৩-৭ ।

সংহিতা গ্রন্থে নির্দিষ্ট ব্যবহার বা মোক্ষদমার পদ্ধতি ও বর্তমান পদ্ধতির তুলনা মূলক আলোচনা ।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—বিক্রমপুরের প্রত্নসম্পদ । ভারতবর্ষ, চৈত্র '৪৩, পৃঃ ৫৭২-৬ ।

বিক্রমপুরের বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত কয়েকটি প্রাচীন মূর্তির বিবরণ ।

দর্শন

গ্রন্থ

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার—বেদান্তচন্দ্রিকা । শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহ । ছদ্মপাণ্ডা গ্রন্থমালা—৪ । রজন পাব্লিশিং হাউস, ২৫১২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা ।

১৮১৭ সনে প্রথম প্রকাশিত বেদান্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্তপ্রতিপাদক গ্রন্থের পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ ।

প্রবন্ধ

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ মিত্র—বাঙালার বাউল ও সহজিয়া সাধন । প্রবর্তক, ফাল্গুন '৪৩, পৃঃ ৫০৯-১২ । বাউল । বিচিত্রা, চৈত্র '৪৩, পৃঃ ২৯১-৩০১ ।

সহজিয়া সাধনের প্রকারভেদ ও মূল ভাবনিদেশ ।

শ্রীভবানীপ্রসাদ নিয়োগী—কঠোপনিষদের প্রতিপাদ্য । প্রবর্তক, মাঘ '৪৩, পৃঃ ৩৯৫-৮ ।

কঠোপনিষদে অশ্বৈত্ত্ববাদের ও জগন্নিখাত্ববাদের কোনও স্থানা পাওয়া যায় না—পক্ষান্তরে ভক্তিবাদের আভাস পাওয়া যায়, এই মত প্রতিপাদন ।

শ্রীশশিভূষণ দাস গুপ্ত—ভক্তিধর্মের বিবর্তন । ভারতবর্ষ, চৈত্র '৪৩, পৃঃ ৪৯৭-৫০৪ ।

ভাগবত তথা চৈতন্যপ্রচারিত ভক্তিবাদের উপর দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব বর্তমান, এই মত প্রতিপাদন ।

শ্রীক্ষেত্রমোহন বসু—প্রজ্ঞানের প্রগতি (৩) । ভারতবর্ষ, চৈত্র '৪৩, পৃঃ ৫২৫-৫৩৪ ।

সক্রেটিস ও ভাঁহার শিষ্যসম্প্রদায়ের দার্শনিক মতবাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ।

শ্রীঅমূল্যকুমার নাগ—বার্কলীর দর্শন । ভারতবর্ষ, চৈত্র '৪৩, পৃঃ ৬১৭-৮ ।

প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য দার্শনিক বার্কলীর মতবাদের বিবৃতি ।

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়—‘স্বপ্ন’ কি ? বিচিত্রা, চৈত্র '৪৩, পৃঃ ২৮৩-৮ ।

স্বপ্নের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা ।

শ্রীঅনিলবরণ রায়—স্বধর্ম নিধনঃ শ্রেয়ঃ । বিচিত্রা, ফাল্গুন '৪৩, পৃঃ ১৫৭-৬০ ।

গীতেক্ত আলোচ্য উক্তিটির তাৎপর্যনির্দেশ ।

বিজ্ঞান

প্রবন্ধ

শ্রীনিরুঞ্জবিহারী দত্ত—বঙ্গদেশের ভেষজ-উদ্ভিদ । প্রকৃতি ১৩২৪৯-৬৪, ৩৩২-৪৫ ।

প্রবন্ধে উদ্ভিদগুলির বৈজ্ঞানিক ও প্রচলিত নাম, প্রকৃতি, ঔষধে ব্যবহৃত অংশ, বাসস্থান ও ব্যবহারিক গুণ উল্লিখিত হইয়াছে ।

শ্রীসুনীলবিহারী সেনগুপ্ত—ভিটামিনের রাসায়নিক গঠন সম্বন্ধে আধুনিক গবেষণা ।

প্রকৃতি, ১৩২৮৯-৪ ।

বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতগণ কর্তৃক কৃত গবেষণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

শ্রীনির্মলচন্দ্র লাহা—স্থলজ উদ্ভিদের বিকাশ । প্রকৃতি, ১৩২৯৪-৯৯ ।

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক মতবাদের বিবরণ ।

শ্রীসত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী—কৃষিকার্য-পরিচালনার আধুনিক প্রণালী । প্রবাসী, মাঘ '৪৩,

পৃঃ ৪৯৯-৫০৩ ।

শস্ত্রক্ষেত্রে জলসংগ্রহ ও জলনির্কাশন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্যের আলোচনা ।

শ্রীনীলরতন ধর—ভারতে কৃষির উন্নতি । প্রবাসী, চৈত্র '৪৩, পৃঃ ৮০৩-৬ ।

ভারতে অমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির বৈজ্ঞানিক উপায় নিরূপণ ।

শ্রীসহায়রাম বসু—কার্ণাধবংসী ছত্রাক ‘পলিপোর’ । প্রবাসী, চৈত্র '৪৩, পৃঃ ৮০৬-৮১০ ।

এই ছত্রাকের পরিচয় ও উহার আক্রমণ প্রতিরোধের উপায় নির্ধারণ ।

শ্রীকমলেশ রায়—জড় ও শক্তির রূপ । ভারতবর্ষ, চৈত্র '৪৩, পৃঃ ৬২১-৬২৬ ।

জড় ও শক্তি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মতবাদের দিগ্‌দর্শন ।

১৮৩৩-৩৪ খ্রিঃ অব্দে হুগলীতে প্রথম বাঙালি অভিধান প্রকাশিত হয়।
 ১৮৩৫-৩৬ খ্রিঃ অব্দে হুগলীতে প্রথম বাঙালি অভিধান প্রকাশিত হয়।
 ১৮৩৭-৩৮ খ্রিঃ অব্দে হুগলীতে প্রথম বাঙালি অভিধান প্রকাশিত হয়।
 ১৮৩৯-৪০ খ্রিঃ অব্দে হুগলীতে প্রথম বাঙালি অভিধান প্রকাশিত হয়।
 ১৮৪১-৪২ খ্রিঃ অব্দে হুগলীতে প্রথম বাঙালি অভিধান প্রকাশিত হয়।
 ১৮৪৩-৪৪ খ্রিঃ অব্দে হুগলীতে প্রথম বাঙালি অভিধান প্রকাশিত হয়।

ভ্রম-সংশোধন

বর্তমান সংখ্যার 'বাংলা' অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাংলা অভিধান' প্রবন্ধে (পৃ. ১৬৩-৭০)
 কয়েকটি ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে। নিম্নে সংশোধন দেওয়া গেল।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬৩	২২	'বাঙ্গালা পোর্ভীগীস'	'বাঙ্গালা-পোর্ভীগীস'
১৬৩	১	'Bengal'	'Bongal'
১৬৪	২৮	'gentleman'	'gentlemen'
১৬৪	৩২	'Seton'	'Seton'
১৬৪	৩৩	'form Calcutta'	'from Calcutta'
১৬৫	২০	'লাড'	'লাড'
১৬৫	২৭	'Sibu'	'Siboo'
১৬৫	৩২	'tootee nameh'	'Tooteenameh'
১৬৬	২৪	'list'	'lists'
১৬৭	২০	'E'	'C'
১৬৭	৩৪	'ইংরেজী-বাংলা'	'বাংলা-ইংরেজী'
১৬৮	১১	'আমরা'	'আমরা'
১৬৮	২৮	'works'	'work'
১৬৮	৩২	'মার্চ'	'মার্চ'
১৬৮	৩২	'বাঙ্গালা'	'বাঙ্গালা'
১৬৯	৮	'fou'	'four'
১৬৯	২২-২৩	'ব্যঞ্জন বর্ণ'	'ব্যঞ্জনবর্ণ'